অনুশীলন

স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী

তত্ত্বানুশীলন।

পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস

শ্রীমৎ স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী

প্রণীত

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য তত্ত্বনিধি

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১॥০ এক টাকা আট আনা মাত্র।

Printed by
SATISH CHANDRA RAI
at the Jagat Art Press, Dacca.

স্নাতং তেন সমস্ত তীর্থসলিলে সর্ব্বাঽপি দত্তাবলি
র্যজ্ঞানাঞ্চ কৃতং সহস্রমখিলা দেবাশ্চ সংপূজিতাঃ।
সংসারাচ্চ সমুদ্ধৃতাঃ স্বপিতরস্ত্রৈলোক্য পূজ্যোপ্যসৌ
যস্য ব্রহ্মবিচারণে ক্ষণমপি স্থৈর্য্যং মনঃ প্রাপ্নুয়াৎ ॥

শ্রীমৎ স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী
প্রণীত।

"পরা বিদ্যার সার।"

বঙ্গভাষায় অতি উৎকৃষ্ট বৈদান্তিক গ্রন্থ। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে; তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা, মূল সত্য বস্তু কি? মায়া, জীব, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, গুণাতীত ব্রহ্ম, ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব, ব্রহ্মানুভূতির সহজ উপায় ব্রহ্ম কি জগতের কারণ? ব্রহ্ম দর্শন, বন্ধন নিবৃত্তি, অদ্বৈত বাদের আশয়, মায়িকবস্তু কে দেখে? জীবন্মুক্তি সুখ, জ্ঞানের রাজত্ব।

তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে যে এই পুস্তকখানি বিশেষ আবশ্যকীয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সাহিত্যের হিসাবেও ইহা বিশেষ উপাদেয়। আশাকরি সুধী সমাজ ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন না।

আমার নিকট নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যাইবে। ভিঃ পিঃ তেও পাঠান হয়। মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
তত্ত্বনিধি।
দুর্গাবাড়ী, ময়মনসিংহ।

নিম্নলিখিত ধাতু ভস্ম সকল আমার নিকট পাওয়া যায়। অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত, পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়

স্বর্ণ ভস্ম	১ তোলা	৫০৲
রৌপ্য	" "	৫৲
তাম্র	" "	৩৲
হরিতাল	" "	২০৲
মুক্তা	" "	২০৲
সহস্রপুটীত লৌহ ভস্ম		৪০৲
" " অভ্র	"	৪০৲

একবারে ১ তোলা ক্রয় করিলে শতকরা ৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য তত্ত্বনিধি।
দুর্গাবাড়ী—ময়মনসিংহ।

বিজ্ঞাপন

আর্য্যভূমির প্রায় সমস্ত শিক্ষিত লোকই বিদ্যা বুদ্ধিতে বাঙ্গালীর প্রশংসা করিয়া থাকেন আর ইহাও দেখিতেছি যে ব্রহ্ম বিদ্যার অনুশীলনে বঙ্গভূমির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্পৃহা দিন দিন বাড়িতে চলিয়াছে কাযেই এইরূপ অবস্থাতে বাঙ্গালীকে লক্ষ্য করিয়া তত্ত্বানুশীলনের অবতারণা করা সুসঙ্গতই বটে কেননা বুদ্ধি মার্জ্জিত না হইলে মানুষের তত্ত্বানুশীলনে যোগ্যতাই জন্মেনা যদি ও এইরূপ বাঙ্গালী ও আছেন, যাঁহারা যুক্তি তর্কের কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠেন, তথাপি আশা আছে যে, বুদ্ধিমান সুশিক্ষিত লোক অবশ্যই এরূপ পন্থা অবলম্বন করিবেন না বিশেষতঃ দার্শনিক বিষয় যে উপন্যাসের ন্যায় দৃষ্টি মাত্রেই বোধ্য হইতে পারেনা, তাহাতেই বা কি সন্দেহ আছে ? যাহাই হউক; যে দেশে জগদীশ, গদাধর ও মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি কুশাগ্রবুদ্ধি দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে দর্শন সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা করা একটা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা নহে সুতরাং আশা করিতে পারি যে ব্রহ্মবিদ্যার সার অদ্বৈতবাদ কখনও বঙ্গবাসীর অবহেলার জিনিষে পরিণত হইবেনা।

অদ্বৈতবাদই তত্ত্বানুশীলনের মুখ্য বিষয়

এস্থলে ইহাও ব্যক্ত করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে যে, প্রথমে মৎ প্রণীত 'পরা বিদ্যার সার" পাঠ করিলে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় গুলি বুঝিতে তত প্রয়াস পাইতে হইবেনা

ময়মনসিংহের "সৌরভ" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক এবং "বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই গ্রন্থের মুদ্রণ বিষয়ে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুণ

দিল্লি
শকাব্দ—১৮৩৯

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

সূচীপত্র।

তত্ত্বানুশীলন।

জগতের স্রষ্টা কে?

আমিই কি আমার প্রতীয়মান জগতের স্রষ্টা? স্মরণাতীত কাল হইতে জগতের সৃষ্টি ব্যাপার অধিকার করিয়া বিভিন্ন মত, বিচার ও কল্পনা চলিয়া আসিতেছে। বেদ, উপনিষদ, দর্শন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতিতেও এই সম্বন্ধে মত বৈষম্য দেখা যায় যুক্তিকে বিদায় দিয়া যদি কেবল শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখিয়া চল যায়, তবে আস্তিকতা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও মত মতান্তরের বিবাদ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই। কিন্তু কপিল ও জৈমিনির মতে চলিলে ভক্ত মণ্ডলীর নিকটে কখনও আদরের পাত্র হইতে পারা যায় না কেননা উভয়েই তাঁহাদের হৃদয়েশ্বরের কোন্ও ধার ধারেন নাই। আর তাঁহাদের পরম প্রিয়তম ভক্তিগ্রন্থে ও ঐ ঋষি যুগলকে নিরীশ্বর এবং কর্ম্মনাস্তিক বলিয়া অবজ্ঞাত হইতে দেখা যায় তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রথমকে তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার বলিয়াই গ্রহণ করেন। এইরূপে যুক্তির সহিত ঐক্য রাখিয়া শাস্ত্রের অনুসরণ করিলে, যেরূপ নানা মতের বিসম্বাদ মিটাইতে পারা যায়না, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন যুক্তির অনুরাগী হইয়া চলিলেও ঐ বৈষম্যাগ্নির জ্বালায় সন্তপ্ত হইতেই হইবে মহা-মায়ার রাজ্যে বৈষম্য নির্ব্বাণ অসম্ভব হইলেও সাম্যবাদী একতা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। যদিও বসুন্ধরাতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সমতার রাজত্ব চলিতেছে এরূপ প্রমাণ আজ পর্য্যন্তও

সংগৃহীত হয় নাই, তথাপি আশা বন্ধ তাঁহাদিগকে প্রবর্ত্তিত কার্য্যের অক্ষয় বটে বান্ধিয়া রাখিয়াছে আর কৃতকার্য্যতার অভাবে ও যে মহদুদ্দেশ্যানুবর্ত্তন মানুষকে অসাধারণভাবে পুণ্যশ্লোক করিয়া তুলে তাহারও উদাহরণ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে যাঁহার উদ্দেশ্য বিগীতই রহিয়াছে তিনি যদি অকস্মাৎ বা আনুষঙ্গিক ভাবে কোন অসামান্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া ফেলেন, তথাপি বিজ্ঞ সমাজে চির দিনের জন্য স্মরনীয় হইয়া থাকিতে পারেন না। কাজেই বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে অবনীপৃষ্ঠে কার্য্য অপেক্ষা উদ্দেশ্যের অধিক সমাদর হওয়া উচিত তবে ইহা সত্য যে যিনি মহদুদ্দেশ্য প্রবর্ত্তিত হইয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কীর্ত্তি ব্রততী যেরূপ অক্ষয় রূপে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত না হইয়া থাকেন, সেইরূপ অপরের সহিত সমকক্ষতা সূত্রে তাঁহাকে বাঁধিতে গেলে বন্ধনকারী নিশ্চয়ই অসুবিবেচক বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়ে

জীবাতিরিক্ত বস্তু হইতে সৃষ্টি সম্বন্ধে যত প্রকারের মত আছে তন্মধ্যে ক্রমবিকাশ বাদই উৎকৃষ্ট। ক্রম বিকাশ বাদকে যাঁহারা কেবল প্রতিচ্য দেশ প্রভব মনে করেন, তাঁহারা আর্য্য ধর্ম্মগ্রন্থ ও দর্শন প্রভৃতির অনুশীলনে পারদর্শিত্ব দেখাইয়া আজ পর্য্যন্তও বিজ্ঞ সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারেন নাই। কেননা উপনিষদ ও সাঙ্খ্যদর্শনে যেরূপ ক্রম বিকাশ বাদ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, বেদের সংহিতা ভাগেও সেইরূপ উহা অভাবগ্রস্ত নহে তবে ইহা সত্য যে প্রতিচ্য ভাবের একনিষ্ঠা ভক্তি, লোকৈষণা ও বিত্তৈষণাকে হৃষ্ট পুষ্ট করিয়া তুলে বর্ত্তমান পৃথিবীতে প্রায় সকলেই ঐ এষণা যুগলের মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এমন কি সন্ন্যাসীদিগকেও আজ "পুনর্মূষিকোভব" নীতিতে ইহার হস্ত ক্রীড়নক হইতে দেখা যায়। আরও দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহাদের জন্য "তমেবৈকমাত্মানং বিজানথ

হন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" অমৃতময় বাক্য উপদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাও আর্য্যভাবে অনার্য্যভাব মিশাইয়া অনাত্মচর্চ্চার শ্রীবৃদ্ধি করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। এমন প্রতিচ্যভাবের সন্ন্যাসী বিরল, যিনি মাতৃভাষায় কথা কহিতে গিয়া ইংরাজী শব্দের প্রযোগ না করেন। যাহাই হউক ক্রম বিকাশবাদ যে বৈদিক যুগেই ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। জগতের স্রষ্টা ঈশ্বর্ প্রকৃতি বা অতিপরমাণু প্রভৃতি যাহাই বলা যাউক না কেন, ক্রমবিকাশ স্বীকার না করিলে সৃষ্টির সুব্যাখ্যা হইবার নহে। তবে যাহারা অন্ধ বিশ্বাসের বলে মানুষের পক্ষে অসম্ভবকেও ঈশ্বরের পক্ষে সুসম্ভব মনে করে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যুক্তি বুঝাইয়া দেয় যে, একই সময়ে অসংখ্য ভাবের সৃজন ক্রিয়া অসম্ভব। কেননা বৃত্তিজ্ঞানের অযোগপদ্য সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য হওয়াতে সমকালিন নানাভাবের ঐ জ্ঞান অসঙ্গত না হইয়া থাকেনা। কাজেই প্রেক্ষা পূর্ব্বিকা সৃষ্টির এক কালিনত্তটা অঘটনীয় ঘটনায় পরিণত হইয়া পড়িল। অর্থাৎ করণীয় বিষয়ের বিশিষ্ট জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়াই আত্মলাভ করিতে দেখা যায় না। তবে ইহা অতীব সত্য যে, পুরাকালের ধর্ম্মপুস্তক রচয়িতারা যুক্তি অপেক্ষা আপ্তবাক্য উহাতে শ্রদ্ধার অধিক সমাদর করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ সমাদর করা যদিও মানুষের পক্ষে বিচার ঔদাসীন্য লইয়া আসে বটে, কিন্তু যথেচ্ছাচারের পল্বলে ডুবিতে দেয় না। বর্ত্তমান অনেক যুক্তিবাদী যে এই পল্বলে ডুবিয়া কদাকার হইয়া উঠিতেছেন, তাহারও একাধিক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। (এই জন্যই কুশাগ্রবুদ্ধি শঙ্কর, আপ্তবাক্য ও যুক্তি উভয়ের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধা দেখাইয়া গিয়াছেন। যেরূপ আপ্তবাক্যে শ্রদ্ধা হারাইয়া যুক্তির গোড়া হইয়া বসিলে মহান্ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, যুক্তির প্রতি অবজ্ঞা করিয়া কেবল আপ্তবাক্যে অন্ধ বিশ্বাসী হইলেও সেইরূপই ঘটে।) আর অন্ধবিশ্বাস যে প্রজ্ঞার

বিকাশ, সত্য নির্ণয় এবং উদার ভাবের অন্তরায় লইয়া আসে, তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।)

একই সময়ে যে, পরস্পর বিরোধী ধর্ম ও গুণের বিবিধ বস্তু বিশিষ্ট এই পৃথিবী আবির্ভূত হইতে পারে না, ইহা বর্তমান বিজ্ঞানও বুঝাইয়া দেয়। এইরূপ অবস্থাতে যিনি খোদা ও আদম হাওয়ার কাহিনীকে সত্য মনে করিয়া বড় বড় পুথি লিখিতে ও বেদীর উপর দাঁড়াইয়া অভিভাষণ দিতে কুণ্ঠিত না হন, তাঁহাকে ধন্যবাদ। আর্য্য ধর্মগ্রন্থে যদিও ঈদৃশ কাহিনীর অভাব নাই, তথাপি ঐ গ্রন্থে নিরঙ্কুশভাবে ইহার গৌরব স্বীকৃত হয় নাই। ভাবগ্রাহী বিজ্ঞ সমাজ এইরূপ কাহিনীকে পরব্রহ্ম বা জ্ঞানের অর্থবাদে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। পরমেশ্বর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে এক সময়েই, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির নিবাসস্থল, তরুলতা ও উদ্ভিদ সমাকুল এবং মণিমুক্তা সুবর্ণাদির আধার এই বিশ্ব মণ্ডল রচনা করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিলেও তাঁহার কল্যাণ গুণ সমূহের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উঠিতে পারা যায় না। ঈশ্বরের গুণাবলী ও কার্য্য সম্বন্ধে মানুষের মীমাংসা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র, ইহাকে আহার্য্য জ্ঞানের প্রভাবে আপ্তবাক্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও তাঁহার কল্যাণ গুণগুলি কে আরোপ করিল এই প্রকার প্রশ্ন কিছুতেই না উঠিয়া থাকিতে পারেনা। যেরূপ দয়া, ন্যায় পরায়ণতা জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতি প্রভৃতিকে মানুষ ঈশ্বরে আরোপ করিয়া লয়, সেইরূপ ইহার বিপরীত অপগুণ গুলিও সে তাঁহাতে কল্পনা করিতে ছাড়েনা। তবে মানুষের পক্ষে আপন কল্পনার বাহাদুরী ও অপরের ঐ সম্বন্ধে ত্রুটি দেখা স্বভাবে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। গ্রাম্য দাদা ঠাকুর ও আপনাকে ভুবন বিদ্যারত্ন অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করে। ঈশ্বরে কল্যাণ বা অকল্যাণ গুণ আরোপ করা যাউক অসঙ্গতি দোষ কিছুতেই বিদূরিত হইবার নহে। কাযেই ভক্তমণ্ডলী

তাঁহাকে গুণধাম করিতে গিয়া দোষধামই করিয়া ফেলিয়াছেন কেননা জগতে যাহা দোষ সামান্যাধিকরণ্যের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে এরূপ গুণ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এজন্যই যাঁহারা পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তাঁহারাও দোষের সংস্পর্শ হইতে সম্পূর্ণরূপে যে মুক্ত হইয়াছেন ইহা বলিতে পারা যায়না। (অধিকন্তু প্রেম ও ভক্তি অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিলে, মানুষ, ক্রমনীতিতে বিচার শক্তিকে হারাইয়া ফেলে। (আরাধ্য দেবে যে কোন প্রকার দোষ আছে ইহা সে কোন মতেই ধারণা করিয়া উঠিতে পারেনা, এবং অবিশ্রান্ত প্রভুর জীবন সমুদ্রে গুণের তরঙ্গ গণিতে থাকে প্রেম ও ভক্তির বন্য, দোষের আগাছা পরগাছা গুলিকে নিজের গর্ভে লুকাইয়া রাখিয়া গুণের কুসুম মালা ভাসাইয়া লইয়া আসে। কিন্তু যে প্রেম ও ভক্তি সুযোগ্য মাত্রায় থাকিলে নর নারীকে দেবতায় পরিণত করে, আবার ঐ উভয়েই নিয়মাতিরিক্ত হইলে তাহাকে কিস্তুত কিমাকার করিয়া তুলে যেমন হরিতাল ভস্ম ও তাম্রভস্ম নিয়মমত প্রযুক্ত হইলে অশেষ রোগ দূর করিয়া স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি লইয়া আসিলেও মাত্রাধিক্যে বিপরীত পরিণাম ডাকিয়া আনে, প্রেম ভক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপই বটে কাজেই জ্ঞানগর্ভা ভক্তি ও তন্মিশ্রিত প্রেমই মনুষ্যের পক্ষে পরম হিতজনক আর স্বয়ং ভগবানও বলিয়া গিয়াছেন "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং" "তেষাং জ্ঞানী নিত্য যুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।"

পরমাণুবাদ ক্রমবিকাশ বাদের সীমা অতিক্রম না করিলেও বিজ্ঞ সমাজের সন্তোষ জনক হইতে পারে নাই পারিবে কি প্রকারে? পরমাণু অতিন্দ্রিয় বলিয়া যেরূপ অজ্ঞেয়, নিরবয়ব হইয়াও পরিমাণ প্রভৃতি গুণ রাখে বলিয়া অসঙ্গতি দোষেও সেইরূপ সমাচ্ছন্ন। কেননা যাহা জ্ঞেয় ও গুণাধার বলিয়া জগতে বিখ্যাত তাহাই ইন্দ্রিয় বেদ্য ও সাবয়ব। আর নিত্য নিরবয়ব বস্তু যে অনিত্য পরিচ্ছিন্ন বস্তুর পরি-

নাম উপাদান হইতে পারে, বিচারশীল ব্যক্তির মন তাহা কোন প্রকারেই মানিয়া লইতে স্বীকৃত নহে (তবে ইহাও সত্য যে, পরমাণু-বাদ হইতে অনেক সুশিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় উক্ত বাদের সমালোচনা শঙ্করভাষ্যে সবিশেষ ভাবে আছে শঙ্কর এই মতের নিরাকরণে বজ্রসার অক্ষয় যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন; প্রকৃতপক্ষে জগতের আদি পরিণাম উপাদান কারণকে অনির্ব্বচনীয় না বলিলে অসঙ্গতি ও ব্যাহতি দোষের গড্ডলিকা কিছুতেই এড়াইতে পারা যায় না)

ইদানিন্তন পাশ্চাত্য ভাবের শিক্ষিত সমাজে বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে অতি পরমাণু বাদের অধিক সমাদর এমনকি প্রাচীন পরমাণুবাদ যে জগতের আদি কারণকে ধরিয়া উঠিতে পারে নাই, ইহাও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ বুঝাইয়া দিতেছেন ইলেকট্রন বা অতি পরমাণুকে জগতের আদি পরিণাম উপাদান কারণ বলিতে গিয়া ধাতুতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক রহস্যের কথা ব্যক্ত করিতেও ছাড়েন নাই। "অতি পরমাণুবাদ হইতে ধাতুর বাস্তবিক লক্ষণ কি ও কিরূপে প্রকাশ পায় তাহা ক্রমনীতিতে জানা যাইতেছে ধাতু বর্ত্তমান সভ্যতার এক প্রধান উপকরণ, কল কারখানা, গৃহাদি, এবং ব্যবহারোপযোগী বিবিধ বস্তু ধাতু হইতেই আত্মলাভ করে কাজেই ধাতুর স্বভাবকে ধরিয়া লইয়া তাহাকে যোগ্যভাবে কার্য্যে লাগাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এই চেষ্টা যে কোনরূপ শুভফল প্রদান করে নাই তাহা নহে গণিতবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা ধাতুর আণবিক অবস্থা এবং অণুর গতি সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্র দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা জাজ্বল্যমান ধাতুর রশ্মি সমূহের অনেক প্রকার অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন দুই বা ততোধিক ধাতু মিশ্রিত করিয়া যে শঙ্কর-ধাতু উৎপন্ন হয় তাহার অভ্যন্তরের

অণুরাশির বিন্যাস, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তরল বায়ুর ন্যায় অতি শীতল পদার্থে এবং বৈদ্যুতিক মহানলের ন্যায় অত্যন্ত উত্তপ্ত স্থানে ধাতুগুলি কিরূপ অবস্থায় থাকে, রাসায়নিক পণ্ডিত তাহা বিবিধ পরীক্ষায় স্থিরীকৃত করিয়াছেন; এই সকল আবিষ্কারে সংসারে প্রচুর জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু এই জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত কাযের দিকটা যে উন্নত হইয়াছে তাহা স্বীকার করা যায় না। ধাতুর ধাতুত্ব কোথায়, তাহা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে না পারিলে ধাতুর ব্যবহারের দিকটা কখনই উন্নতিলাভ করিতে পারে না। আজকাল অনেকে বিভিন্ন প্রকারের ধাতু, বিভিন্ন পরিমাণে মিশাইয়া ইচ্ছানুরূপ বহুগুণবিশিষ্ট শঙ্কর ধাতু প্রস্তুত করিতেছেন বটে, কিন্তু এই মিশ্রণ-ব্যাপারে কোনও অটল নিয়ম ধরা পড়িতেছে না। যে মূল ব্যাপার ধাতুকে তাপ ও বিদ্যুতের পরিচালক করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাতসহ ও কোমল না করিয়া ছাড়ে না তাহার আবিষ্কার না হইলে কোন ক্রমেই ধাতুকে মনুষ্যের সম্পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী করা যাইতে পারে না।

(বিদ্যুৎ পরিচালন শক্তি ধাতু মাত্রেরই একটা প্রধান সাধারণ ধর্ম। কাষ্ঠ বা প্রস্তরের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ সহজে চলা ফিরা করিতে পারে না, কিন্তু ধাতুর মধ্য দিয়া অতি সহজেই পারে। এই কারণেই টেলিগ্রাফ্, টেলিফোন্ প্রভৃতিতে বিদ্যুৎ পরিচালন জন্য ধাতুর তার ব্যবহৃত হয়। কার্পাস সূত্র বা রজ্জুর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিতে পারে না। ধাতুর এই বিদ্যুৎ পরিবাহক-শক্তির উপরেই বৈজ্ঞানিক-দিগের প্রথম দৃষ্টি পড়িয়াছিল। ধাতুর অণু পরমাণু কোন্ বিশেষ গুণে বিদ্যুৎ বহিয়া লইয়া যাইতে পারে ইহাই তাঁহারা প্রথমে অনুসন্ধান করিতে থাকেন। এই অনুসন্ধানের ফলে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বড়ই অদ্ভুত। ডালটন সাহেবের আণবিক সিদ্ধান্ত প্রচার হইবার পর হইতে আমরা জানি, পদার্থমাত্রই অতি সূক্ষ্ম অণু

দ্বারা গঠিত এবং এই অণুগুলি আবার দুই বা ততোধিক সূক্ষ্ম পরমাণুর যোগে উৎপন্ন অণু পরমাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এত অধিক প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে যে, ডালটনের সিদ্ধান্তে সন্দেহ করিবার আর কারণ দেখা যাইতেছে না * কিন্তু এত জানা সত্ত্বেও পদার্থে অণু পরমাণু কি প্রকারে বিন্যস্ত থাকে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারি নাই আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণায় ধাতুর আভ্যন্তরীণ এই আণবিক অবস্থার অনেক কথা জানা গিয়াছে ইঁহারা বলিতেছেন যে, যে ধাতুপিণ্ডটিকে আমরা স্থূলদৃষ্টিতে নিরেট দেখিতেছি, তাহা প্রকৃত নিরেট নহে ধাতুর অভ্যন্তরে পরমাণুগুলি সুবিন্যস্ত থাকিয়া মৌচাকের মত এক সছিদ্র পিণ্ডের রচনা করে পরমাণুর এই প্রকার সুবিন্যাসের সহিত, বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্বেই পরিচিত ছিলেন, গাঢ় চিনির রস জমিয়া যখন দানাদার চিনি বা মিশ্রির উৎপত্তি করে, তখন ঐ প্রকার আণবিক সুবিন্যাস দেখা যায় কিন্তু গুরু ধাতু-পিণ্ডের ভিতরেও যে অণু পরমাণু সুসজ্জিত হইয়া দানার উৎপত্তি করে এবং মধুচক্রের ন্যায় ধাতুপিণ্ড মাত্রই যে সছিদ্র, এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নূতন কেবল ইহাই নহে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ আরও বলিতেছেন যে, ধাতুমধ্যস্থ সেই সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি অতি পরমাণুতে পূর্ণ বায়বীয় বস্তুর অণু যেমন সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকে এবং পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া অবিরাম ছুটাছুটি করিতে থাকে ধাতুছিদ্রস্থ ইলেকট্রন গুলিও সেই প্রকার চঞ্চল হইয়া চলাফেরা করে আজ প্রায় ১২ বৎসর ধরিয়া নানা দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ইলেকট্রন লইয়া গবেষণা করিতেছেন রেডিয়ম ধাতু হইতে নির্গত ইলেকট্রনে বা ক্রুক্‌স্ সাহেবের নলের মধ্যস্থিত ইলেক-ট্রনে ইঁহারা সকল অবস্থাতেই ঋণাত্মক বিদ্যুতের (Negative electricity) সন্ধান পাইয়াছেন ; ইলেকট্রন মাত্রেই যে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-বাহক, তাহা নিঃসন্দেহে স্থির হইয়া গিয়াছে কাজেই ধাতুর অভ্যন্তরস্থ

ছিদ্রে যে ইলেকট্রন আবদ্ধ থাকিয়া চলাফেরা করে, তাহাতে প্রচুর ঋণাত্মক বিদ্যুৎ থাকে বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, ইলেকট্রনের ঋণাত্মক বিদ্যুৎ এবং অণুতে ধনাত্মক বিদ্যুৎ (Positive electricity) পরস্পর টানাটানি করিয়া এমন সাম্যভাবে থাকে যে, আমরা বাহির হইতে ধাতুতে ধন বা ঋণ কোন প্রকার বিদ্যুতেরই লক্ষণ দেখিতে পাই না

ধাতু মাত্রেরই অল্প বা অধিক পরিমাণে যে বিদ্যুৎ পরিবাহনশক্তি দেখা যায়, ধাতুর মধ্যে আবদ্ধ পূর্ব্বোক্ত ইলেকট্রনের সাহায্যে আজকাল তাহার ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, একখণ্ড ধাতুকে বৈদ্যুতিক শক্তির সীমার মধ্যে আনিলে, তাহার ছিদ্র মধ্যবর্ত্তী ইলেকট্রনগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির দিকে ছুটিয়া চলিতে আরম্ভ করে ইহাতে ধাতুর মধ্যে যে একটা ইলেকট্রনের প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহাই আমাদের নিকট বিদ্যুতের প্রবাহ স্বরূপে প্রকাশ পায়।

সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ বায়ব পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে পদার্থটা স্ফীত হইতে চায় এবং পাত্রের গায়ে জোরে চাপ দিতে থাকে অনুসন্ধানে ইহার কারণ এই স্থির হইয়াছে যে, তাপ পাইলেই বায়ব পদার্থের অণুগুলির চঞ্চলতা বাড়িয়া যায়, এই অবস্থায় ইহারা দ্রুত-বেগে পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া জোরে পাত্রের গায়ে আসিয়া পড়ে; কাজেই চাপের মাত্রা তাপ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলে তাপ প্রয়োগ করিলে ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহন শক্তি কমিয়া আসে; এই সুপরিচিত ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিকগণ তাপ বৃদ্ধির সহিত ধাতুমধ্যস্থ ইলেকট্রনের গতি বৃদ্ধির কথা প্রচার করিতেছেন ইলেকট্রন গুলি গুরুত্বে ও আয়তনে এত ক্ষুদ্র যে ইহাদের তিন হাজার ছয় শতটি একত্র না হইলে একটি হাইড্রোজেনের অণুর সহিত সমান হয় না। গুরুত্বের এই পরিমাণ লইয়া হিসাব

করিয়া দেখা গিয়াছে, কোন নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতার অবস্থায় হাইড্রোজেনের অণুগুলি যে বেগে পরিভ্রমণ করে, ইলেকট্রনগুলি সেই অবস্থায় ধাতুর অভ্যন্তরে প্রায় তাহার ষাইট গুণ বেগে চলাফেরা করিয়া থাকে। এই হিসাবে বরফের ন্যায় শীতল অবস্থাতেও প্রত্যেক ইলেকট্রনকে প্রতি সেকেণ্ডে শতাধিক মাইল বেগে পরিভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে কামান বা বন্দুকের গুলি যত জোরে ছোঁড়া যায়, বাহিরের ভূমধ্যাকর্ষণ বা অপর কোন বাধা বিঘ্ন ভেদ করিয়া তাহা ততই বেগে ধাবমান হয় তাপ প্রয়োগে ধাতুগর্ভে আবদ্ধ ইলেকট্রনগুলি যখন গোলা গুলির ন্যায় প্রবলতর বেগে ছুটাছুটি আরম্ভ করে তখন বাহিরের নির্দ্দিষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তি তাহাদিগকে নিজের দিকে টানিয়া প্রবাহের উৎপত্তি করিবার সুযোগ পায় না, কাজেই এই অবস্থায় বিদ্যুৎ-শক্তির টান অপেক্ষা তাপের চঞ্চলতাই প্রাধান্য লাভ করে, সুতরাং অধিক বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন হইতে পারে না

কেবল বিদ্যুতের পরিবাহনেই ইলেকট্রনের কার্য্য ধরা পড়ে নাই, ধাতুর তাপ পরিচালন ব্যাপারটও এখন ইলেকট্রনের সাহায্যে বুঝাযাইতেছে বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন যে, দীর্ঘ ধাতু দণ্ডের এক প্রান্তে তাপ দিলে যখন তাহার দূরবর্ত্তী প্রান্ত পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া দাঁড়ায়; তখন বুঝিতে হয়, তাপ প্রাপ্ত অংশের ইলেকট্রনই উত্তাপ বহন করিয়া ধাতুর সর্ব্বাঙ্গে তাপ পরিচালিত করে এই ব্যাখ্যানে ও তাপ সংযোগে গতি সূক্ষ্ম ইলেকট্রন গুলির যে বেগ বৃদ্ধি পায়, বৈজ্ঞানিক তাহারই শরণাপন্ন হইয়াছেন ইঁহারা বলিতেছেন, তাপ পাইলে ধাতুর ছিদ্র স্থিত ইলেকট্রন গুলির চঞ্চলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে কাযেই এই অবস্থায় সে গুলি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া ধাতুর সর্ব্বাঙ্গে তাপ বহন করিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করে

দুইটী পৃথক ধাতুকে জুড়িয়া, তাহাদের সংযোগ স্থানে তাপ দিতে

থাকিলে, আপনা হইতেই এই সংযুক্ত ধাতুতে বিদ্যুতের প্রবাহ উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এই বিদ্যুতকে Thermo electricity অর্থাৎ তাপজ বিদ্যুৎ বলা হইয়া থাকে বিদ্যুতের নাম যাহাই হউক, কি প্রকারে কেবল তাপ দ্বারা বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়, আজ পর্য্যন্ত তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যান আমাদের জানা ছিলনা আধুনিক ইলেকট্রন সিদ্ধান্ত দ্বারা এই ব্যাপারের ও কারণ নির্দ্দেশ করা গিয়াছে বৈজ্ঞানিক বলেন ধাতুর ছিদ্রে যে সকল ইলেকট্রন থাকে, সকল ধাতুতে তাহাদের সংখ্যা সমান দেখা যায় না সীসক (Lead) এবং বিস্‌মথ উভয়ই ধাতু পদার্থ, কিন্তু তাহাদের ভিতরকার ইলেকট্রনের সংখ্যা হিসাব করিতে গেলে দেখা যায়, বিস্‌মথের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশে যে পরিমাণে ইলেকট্রন আছে, সীসাতে ঠিক তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ বর্ত্তমান থাকে বৈজ্ঞানিকগণ ধাতু মধ্যস্থ ইলেকট্রনের সংখ্যার এই অসমতাকেই তাপজ বিদ্যুতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন

মনে করা যাউক, একটী বিস্‌মথের দণ্ড এবং আর একটী সীসকের দণ্ড জোড়া দিয়া তাহাদের সন্ধিস্থলে তাপ দেওয়া যাইতেছে এই ব্যবস্থায় বিস্‌মথ হইতে সীসকের দিকে একটী সুস্পষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ চলিতে দেখা যাইবে বৈজ্ঞানিকগণ ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন সীসাতে ইলেকট্রনের সংখ্যা বিস্‌মথের তুলনায় অনেক অধিক থাকে কাজেই তাপ সংযোগে সেগুলি অত্যন্ত বেগবান হইয়া এবং উত্তপ্ত সন্ধিস্থল অতিক্রম করিয়া বিস্‌মথের দিকে ধাবমান হয়, ইহাতে সীসক হইতে বিস্‌মথের দিকে ঋণাত্মক তড়িৎ পূর্ণ একটী ইলেকট্রনের প্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে, আমরা বাহির হইতে এই ঋণাত্মক প্রবাহকেই বিস্‌মথ হইতে সীসার দিকে চালিত বিপরীত মুখী ধনাত্মক তড়িৎ প্রবাহ রূপে দেখিতে পাই

দুইটী পৃথক ধাতুকে পূর্ব্বোক্ত রূপে জুড়িয়া তাহাদের সন্ধিস্থলের

ভিতরে বিদ্যুতের প্রবাহ চালাইতে থাকিলে সন্ধিস্থল কখনও উষ্ণ কখন ও শীতল হইয়া পড়ে পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে বিস্মথ হইতে সীসার দিকে না চালাইয়া যদি তাহাকে গুরুভার বিশিষ্ট সীসক হইতে বিস্মথের দিকে চালান যায়, তবে উহারই ঠিক বিপরীত ফল দেখা যাইবে এই ব্যবস্থায় সন্ধিস্থল অপর অংশের তুলনায় স্পষ্ট শীতল হইয়া পড়িবে বিদ্যুৎ প্রবাহে যুগ্ম ধাতুর এই প্রকার কার্য্যের কথা বহুদিন হইতে আমাদের জানা আছে বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে Peltier effect নাম দিয়াই এপর্য্যন্ত তৃপ্ত ছিলেন ব্যাপারটির কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার কোনটিই সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় না যাহা হউক ইলেকট্রনের সাহায্যে ধাতু পদার্থের এই বিশেষ তত্ত্বটির ও এক ব্যাখ্যান আমরা পাইতেছি বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন আমরা যখন সীসক ও বিস্মথের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিত করি, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে বিস্মথের ইলেকট্রন গুলিকে জোর করিয়া যেন সীসকের ইলেকট্রনের সহিত মিশান হয় কাযেই ফুটবলের থলির ভিতরে জোরে বাতাস পম্প করিলে, যেমন বলটি গরম হইয়া উঠে, এখানে ও জোরে বিস্মথের ইলেকট্রন সীসাতে প্রবেশ করিয়া সন্ধিস্থল গরম করিয়া তুলে এখন মনে করা যাউক, যেন প্রবাহটিকে সীসক হইতে বিস্মথের দিকে চালান যাইতেছে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিস্মথ হইতে সীসক গুরু, কাজেই ইহাতে ইলেকট্রনের সংখ্যাও অধিক সুতরাং সীসক হইতে বিদ্যুৎ চালনা করায়, সীসকের ইলেকট্রন ভাণ্ডারই ক্রমে শূন্য হইতে থাকে, এবং পূর্ব্বে যে স্থানে বহু ইলেকট্রন একত্রিত ছিল, শূন্য স্থান পাইয়া তাহা এক্ষণ স্ফীত হইতে আরম্ভ করে আবদ্ধ স্থানের বায়ব বস্তুকে হঠাৎ স্ফীত হইবার অবকাশ দিলে উহার তাপ আপনা হইতেই কমিয়া আসে। কাজেই সীসকের

ইলেকট্রন গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রসারিত হওয়ায় এখানেও তাপের মাত্রা কমিয়া যায়

পদার্থের অণুপরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয় বস্তু হইলেও বৈজ্ঞানিকগণ নানা কৌশলে তাহাদের আয়তন এবং গুরুত্বাদি নির্ণয় করিয়াছেন ইলেকট্রন সিদ্ধান্তের সাহায্যে ধাতুর অণুপরমাণুর আয়তনাদি সম্বন্ধে নূতন করিয়া পরিচয় স্থাপনের সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে তাপ জাত বিদ্যুতের Thermo electricity উৎপত্তি প্রসঙ্গে যে ইলেকট্রনের কথা বলা হইয়াছে তাহার সাহায্যে প্রত্যেক পরমাণুতে কতগুলি করিয়া মুক্ত ইলেকট্রন থাকে তাহা হিসাব করিয়া নির্ণয় করা হইতেছে এবং তার পর বিদ্যুৎ পরিবাহনের Electric conduction নব সিদ্ধান্তের সাহায্যে সমবেত ইলেকট্রনের সংখ্যা জানিয়া লইয়া ধাতুর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে কতগুলি পরমাণু রহিয়াছে নির্ণয় করিতে পারিলে প্রত্যেক পরমাণুর আয়তন নির্ণয় করা কঠিন হয় না কাজেই প্রত্যেক ঘন ইঞ্চি স্থানে কতগুলি পরমাণু আছে জানিয়া লইয়া প্রত্যেক পরমাণুর আয়তন স্থির করা হইতেছে

কাচ, জল ও বায়ু প্রভৃতি অল্লাধিক পরিমাণে স্বচ্ছ, কিন্তু কোন ধাতুই স্বচ্ছ নহে ইলেকট্রন সিদ্ধান্ত দ্বারা ধাতুর এই বিশেষ ধর্ম্মটির ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে। ধাতুমধ্যস্থ মুক্ত ইলেকট্রনই ধাতুকে অস্বচ্ছ করে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন ধাতুর উপরে আলোক পাত হইলেই ইলেকট্রনগুলি আলোক তরঙ্গ শোষণ করিয়া লয়। যখন ধাতুকে পিটাইয়া খুব সূক্ষ্ম পাতে পরিণত করা যায়, তখনই কেবল এক একটু আলোক ধাতু ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে স্বর্ণের সূক্ষ্ম পাতের ভিতর দিয়া যে আলোক বাহিরে আসে তাহা সবুজ, নূতন সিদ্ধান্তীরা বলিতেছেন, এস্রাজ বা সেতারের তার বিশেষ বিশেষ সুরে বাঁধিয়া রাখিলে, তাহারা নাড়া পাইলে যেমন সেই

সকল বাঁধ সুর ব্যতীত অপর সুরের ধ্বনি করিতে পারেনা; সেই প্রকার বিশেষ বিশেষ ধাতুর রন্ধ্রে আবদ্ধ ইলেকট্রন গুলি এক একটি বিশেষ আলোক তরঙ্গ ব্যতীত অপর তরঙ্গের সারা দিতে পারে না। স্বর্ণের রন্ধ্র গত ইলেকট্রন কেবল সবুজ রঙ্গের উৎপাদক তরঙ্গেরই সারা দেয়, কাজেই সোণার পাতের ভিতর দিয়া যে আলোক আসে তাহা সবুজ নানা জলন্ত ধাতুর বর্ণচ্ছত্রে (Spectrum) কেন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বর্ণ রেখার প্রকাশ হয় পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বটি অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ তাহার মীমাংসা করিতেছেন। তদ্ব্যতীত আলোক রশ্মির সমতলি ভবন (Polarisation of Light) ইত্যাদি অনেক জটিল প্রাকৃতিক ব্যাপারের কারণ ইলেকট্রন সিদ্ধান্ত দ্বারা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এই জটিল বিষয় গুলির ব্যাখ্যাও এত জটিল যে, সে গুলির উল্লেখ মাত্র করিয়া এখানেই আমাদিগকে নিরস্ত হইতে হইল।"

এই ইলেকট্রন সিদ্ধান্তের লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় অনেক বৈজ্ঞানিক গূঢ়তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু অতি পরমাণুকে অজ্ঞেয়ভাব অন্ধকার হইতে প্রমা জ্ঞানের আলোকে আনিয়া দার্শনিকের সন্তোষ জন্মাইতে পারেন নাই। যাহাই হউক তিনি যে এইরূপ শিক্ষণীয় গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাতৃভাষায় ব্যক্ত করিয়া জন্মভূমির লোকের উপকার করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। অণু, পরমাণু ও অতি পরমাণু যে অতীন্দ্রিয় তাহা যখন তিনি স্বীকার করিয়াছেন, তখন এই ত্রিতয়ের সকল গুণাবলি ও ধর্ম্ম যে অতীন্দ্রিয় ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না। কাজেই অতীন্দ্রিয় বস্তু যে সুপরিজ্ঞেয় হইতে পারে তাহার উদাহরণ পাওয়া যায় না বলিয়া এই বাদ ত্রয়ের প্রতি যুক্তিবাদী কি প্রকারে আস্থা সংস্থাপন করিতে পারেন? তবে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত দিগের বাক্যকে আপ্ত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার কথা স্বতন্ত্র। অনাবৃত বা যন্ত্রাবৃত জ্ঞান ইন্দ্রিয় হইতে যে সকল বৈজ্ঞা-

নিক ব্যাপারের তত্ত্ব পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু না থাকিলেও আনুমানিক বা সাম্ভাবনিক বৈজ্ঞানিক বিষয়কে 'ইদমেব তত্ত্বং' বলিয়া ধরিয়া লওয়া কখনও সুবিবেচনার কার্য্য নহে। কেনন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত উত্তরোত্তর অপর সিদ্ধান্ত হইতে অপর সিদ্ধান্তে পরিণত হইতে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে বৈজ্ঞা-নিকের নিকটে কার্য্য জগতের অনেক তত্ত্ব পাইবার আশা করিতে পারিলেও আদিকারণ সম্বন্ধে সবিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কারের আশা করা যায় না। আর বৈজ্ঞানিকগণ যে বহির্জগৎ লইয়া সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকাতে অন্তর্জগতের তত্ত্ব গবেষণার অবকাশ পান না তাহাও অতীব সত্য। সুতরাং অন্তরতম আদিকারণকে যে বৈজ্ঞানিকগণ কখন স্বয়ং বুঝিতে বা অপরকে বুঝাইতে সমর্থ হইবেন তদ্বিষয়ে যুক্তি বাদী বা অধ্যাত্মবাদী কিছুতেই প্রত্যয়ান্বিত হইতে পারেন না। লেখক ইলেকট্রন সম্বন্ধে যত প্রমাণ দেখাইয়াছেন, ঐগুলির মধ্যে একটাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়না এবং অনুমান বা সম্ভাবনা যে মানুষকে অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা হইতে মুক্ত করিতে পারেনা তাহাও অসত্য নহে। কাজেই অধ্যাত্ম বাদের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া জড় বাদের অতীন্দ্রিয় ইলেকট্রনের শরণাপন্ন হওয়া বিচার শীলতার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেনা। অবশ্যই তিনি যে ঘটনা গুলিকে অতি পরমাণুর কার্য্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, সেই গুলিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিষয় করে, কিন্তু তাহাদের আদিকারণ যে ইলেকট্রনই বটে, ইহা ইন্দ্রিয় বেদ্য নহে, এইজন্য বাধ্য হইয়া ইলেকট্রনকে অনুমিতি বা সম্ভাবনার শরণে লইয়া যাইতে হয়। যখন পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা পরবর্ত্তী ঘটনার কারণ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য, তখন "সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ বায়ব পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে পদার্থটা স্ফীত হইতে চায় এবং পাত্রের গায়ে জোরে চাপ দিতে থাকে।" এই ঘটনা ছাড়িয়া কারণত্বের ব্যাখ্যার জন্য অণুর

চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাওয়া পর্য্যন্ত যাওয়ার আবশ্যকতা কি? সাদা কথায় পাত্রের গায়ে জোরে চাপ দেওয়ার কারণ পদার্থের স্ফীতী ভবন এবং স্ফীতী ভবনের কারণ তাপ প্রযোগ বলিলেই চলে। কেননা তাপ প্রযোগ দৃষ্ট ঘটনা আর অণুর চাঞ্চল্য অদৃষ্ট ঘটনা এইরূপে "তাপ প্রযোগে ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহন শক্তি কমিয়া আসে" এই দুই ঘটনার মধ্যে প্রথমটিকে দ্বিতীযটির কারণ বলিলেই গোলযোগ মিটিয়া যায়, কিন্তু ইহার জন্য তাপবৃদ্ধির সহিত ধাতু মধ্যস্থ ইলেকট্রনের গতি বৃদ্ধির কথা প্রচার করিতে যাওয়া" শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে হয় না নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে এক এক করিয়া পরীক্ষা করিলে প্রত্যক্ষ ঘটনা কে উপেক্ষা করিয়া অতীন্দ্রিয় ইলেকট্রনের অতীন্দ্রিয় ঘটনার অনুসরণ ব্যাপারটা কিছুতেই বিচার নৈপুণ্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় না পক্ষান্তরে কারণে যে কার্য্য জননী শক্তি আছে বলিয়া বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন এই সম্বন্ধে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে কার্য্য ও কারণ ব্যতীত একটা তৃতীয়া শক্তি অদ্যাপী ও কোন পরীক্ষকের পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হয় নাই যাঁহারা প্রাচ্য আন্বিক্ষিকী বিদ্যার সহিত পরিচিত তাঁহারা জানেন যে, শক্তি জিনিষটা কেবল কথার কথা মাত্র পরন্তু বৈজ্ঞানিক মহোদয়েরা শক্তির এক নিষ্ঠা ভক্তিকে কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছেন না। যদিও শক্তিকে আজ পর্য্যন্তও কেহ অজ্ঞেয়তার তিমির হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ইহার অস্তিত্বের অটল বিশ্বাস শিথিল হয় নাই যাহা হউক; শক্তির উপাসক হইয়া তাঁহারা যে মহামায়ার রাজ্যের অনেক উপকার বিধান করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই

পরমাণু ও অতিপরমাণু বাদের ন্যায় প্রকৃতি বাদ ও বিজ্ঞব্যক্তির সন্তোষ জন্মাইতে পারে নাই। পারিবে কি প্রকারে? জড় প্রকৃতি চৈতন্য নিরপেক্ষ হইয়া মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি বিকার উৎপন্ন করিতেছে এবং

স্বয়ং অবিকৃত রহিয়াছে, বিচার বিমূঢ় না হইলে কেহই ইহা স্বীকার করিতে পারেনা। কেননা চৈতন্যের অপেক্ষা না রাখিয়া জড় বস্তু যে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত নাই এবং বিকৃত পদার্থের জননী হইয়াও কেহই স্বয়ং অবিকৃত থাকিতে পারেনা। বীজের বীজত্ব অব্যাহত থাকিতে অঙ্কুরোদ্গম অসম্ভব। যখন অঙ্কুর হয় তখন বীজ বিকৃত হইয়া অঙ্কুরেরই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুগ্ধের বিকারেই ছানা, মাখন, ঘৃত প্রভৃতি হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে দুগ্ধই ঘৃতের আদি স্থান, কিন্তু সে স্বীয় মৌলিকত্ব বজায় রাখিয়া কখনও ঘৃতের উৎপত্তি করিতে পারে না। সুতরাং কোন জিনিষ যে স্বস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অন্য পদার্থের উৎপত্তি করিতে পারে ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক। তবে জগতের আদি কারণ যে অব্যক্ত ইহাতে অপ্রামাণ্য দোষ আসিতে পারেনা। আর নিত্য বস্তুকে বিকার গ্রস্ত জিনিষের পরিণাম উপাদান বলাতে ও কেবল কথার বাহাদুরীই দেখাতে পাওয়া যায়। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য, প্রকৃতি বাদকে শিষ্টের অপরিগ্রহণীয় বলিয়া খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে প্রকৃতি বাদে অসঙ্গ নির্গুণ নানা চেতন স্বীকার করাতেও নির্যুক্তিকতা দোষ আসিয়া পড়ে। কারণ গুণ বা ধর্ম্মই নানাত্বের নিয়ামক। বিশেষতঃ বন্ধন ও মুক্তির ব্যবস্থা করিতে যাইয়া অখণ্ড নির্লেপ পদার্থকে নানা করিয়া তুলাতে যে মহতী অব্যবস্থার আবির্ভাব হয় ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। আর যখন মায়া বাদে ঐরূপ বস্তুকে এক মানিয়াও বিভিন্ন অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধি সংপ্রয়োগে বন্ধন মুক্তির ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তখন ইহার জন্য অখণ্ড নির্লেপ ব্রহ্ম চৈতন্যের উপরে নানাত্বের কলঙ্ক আরোপ করা কখনই সুবিবেচনার কার্য্য বলিয়া প্রথিত হইতে পারে না।

পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন এই ধারণারই অধিক প্রসার

দেখিতে পাই বন্য, অসভ্য, সুসভ্য যে কোন আস্তিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যাউক না কেন, সকলেই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন প্রণালী ও ইতি কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও প্রভু যে জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা ইহাতে সকলেই একমত। এমন কি পরমেশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা না বলিলে আস্তিক সমাজে স্থান পাওয়াই দুর্ঘট হইয়া উঠে বুদ্ধি শক্তি বা বিচার শক্তি দ্বারা, ঈশ্বর যে স্বমহিমায় বিশ্বমণ্ডলের রচনা করিয়াছেন ইহা বুঝিতে না পারিলেও বিশ্বাস বলে মানিতেই হইবে যে প্রভু হইতেই জগতের প্রভব হইয়াছে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে,—সাধারণের হিতব্রতে ব্রতী হইয়া কেহ যদি গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অথচ ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সম্বন্ধে দ্বিভাব রাখেন, তবে তিনি আস্তিক সমাজে অবজ্ঞাত না হইলেও আদরের পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না ফল কথা আস্তিক সমাজের সম্মান পাইতে হইলে, ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব নির্ব্বিচারে স্বীকার করিতেই হইবে পক্ষান্তরে উক্তরূপ স্বীকার করিয়া যিনি নিয়ত দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠানও করেন, আস্তিক সমাজ তাহাকে ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তবে সখের ধার্ম্মিক ও বক ধার্ম্মিকের কথা পাড়িলে অবশ্যই অন্যরূপ দাঁড়ায় এইরূপ ব্যক্তি স্বকার্য্য সাধনে সতর্কতার সহিত তৎপর থাকিলেও সময়ে ধরা পড়িয়া যায়

বিশ্ব নির্ম্মাতাকে দোষ সংস্পর্শ পরিশূন্য রাখিবার নিমিত্ত কৃতবিদ্য আস্তিকগণ বহুবিধ কৌশল উদ্ভাবন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু জীর্ণ গৃহের একদিক সংস্কার করিতে গেলে যেমন অপর দিক ভাঙ্গিয়া যায় তদ্রূপ তাঁহাকে ন্যায় পরায়ণ বলিলে দয়ালুত্বের দিক্‌টা বিকৃত হইয়া পড়ে এবং দয়ালু বলিয়া খ্যাপন করিলে ন্যায় পরতার দিকে অন্যায়ের আগুন লাগিয়া উঠে সুতরাং এইরূপ কঠিন সমস্যায় পড়িয়া অবশেষে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া উঠেন যে, ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন

বিষয়ের মীমাংসা করিতে যাওয়া মানুষের পক্ষে দুঃসাহসিকতা মাত্র ; কেননা তুচ্ছ মানব বুদ্ধি কি অনন্তের মহিমা বুঝিয়া উঠিতে পারে ? কিন্তু বিচার্য্য স্থল এই যে, মানব বুদ্ধি যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন্ বিষয়ের সমাধান করিতে না পারে, তবে তাঁহাকে বিশ্বনির্ম্মাতা বলিয়া ঘোষণা করিবার তাহার কি অধিকার আছে ? বিশ্ব নির্ম্মাতাই বল আর দয়ালু ন্যায়পরায়ণ সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি যাহা বলিয়াই প্রথিত করনা কেন, সকলই মনুষ্য বুদ্ধির বিজৃম্ভন ব্যতীত আর কিছুই নহে। কাজেই মানব বুদ্ধি যেমন তাঁহাকে দয়ানিধি, ন্যায়ের সমুদ্র ও সর্ব্বদর্শী বলিয়া বুঝে, সেইরূপ নিষ্ঠুর যথেচ্ছাচারী এবং অল্পদর্শী ও সাব্যস্ত করিতে পারে উভয়ের মধ্যে কোন্ পক্ষেই বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যায়না। তবে প্রেম ও ভক্তি প্রথম পক্ষে সুসমঞ্জস যাহা হউক মানব বুদ্ধি যদি মূল বস্তু হইতে সুদূরেই থাকিয়া যায়, তবে তাহার আস্ফালনের সার্থকতা কোথায় রহিল ? তবে ইহা সত্য যে ঈশ্বর সম্বন্ধে কুসৃষ্টি করিতে গেলে মনুষ্যের অমনুষ্যত্বই ব্যক্ত হইয়া পড়ে

প্রভু হইতে এই সুবিশাল বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে এই সম্বন্ধে ধারাবাহিক রূপে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিলে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, বেদের সর্ব্বাত্মক সগুণ ঈশ্বরই বিশ্বরচনার মূলে রহিয়াছেন,—পরন্তু ঐ ঈশ্বর আর বিশ্ব একই পদার্থ একই বস্তু কেবল ভাবের বৈলক্ষণ্যে সৃষ্ট ও স্রষ্টা বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকে সমষ্টি ভাবে যাহা সুমহান্ ও অনন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ব্যষ্টি ভাবে তাহাই ক্ষুদ্র কণারূপে ধরা দেয় কাজেই একই বস্তু কার্য্য ও কারণ প্রভৃতিরূপে মনোনীত হইয়া দার্শনিক ও কবিকে বিচার এবং ভাবের সুর তটিনীতে কখন ডুবাইতেছে কখন ভাসাইতেছে ইহার সম্বন্ধে বিচার করিতে যাইয়া দার্শনিক যেরূপ অনন্ত বিচার্য্য বিষয় দেখিতে পান, কবি ও সেইরূপ অসংখ্য ভাবের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে থাকেন। বিচারের অঞ্জন

লাগাইয়া দেখিলে যদিও অনির্ব্বচনীয় মায়া ও তদধিষ্ঠান ব্রহ্ম চৈতন্য অবিভক্ত অবস্থাতে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তথাপি ভাব বিহ্বল চিত্ত ক্ষেত্রে ঐ মায়াই ব্রহ্মযোগে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া থাকে বিচার চক্ষুতে দেখিতে গেলে যাহার আসল অংশ ব্যতীত অপর সমস্ত অংশ অসার ও স্বয়ং সত্ত্বাশূন্য হইয়া দাঁড়ায়, ভাবের দ্রাক্ষাসব পান করিলে তাহাই সৌন্দর্য্যের শান্তিপুরী ধৃতি পরিয়া কান্তিচ্ছটায় মন মাতাইয়া তুলে বিচার ও ভাবের কার্য্যগত বিভিন্নতা এই যে, প্রথম, মানুষকে অসত্য অংশে বিরক্তি জন্মাইয়া মূল সত্য ভাগের দিকে লইয়া যায় এবং দ্বিতীয়, সত্য অংশের যোগে অসত্য ভাগকে ও সত্যে পরিণত করিয়া দেয় সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, বিচারের ব্রহ্ম বিশ্ব মণ্ডলের আসল সত্য অংশ আর ভাবের ঈশ্বর অসার ও সত্য অংশে মিশ্রিত সমস্ত বিশ্ব মণ্ডল

সগুণ ঈশ্বর কে অধিকার করিয়া যত প্রকারের মত অস্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তন্মধ্যে সর্ব্বাত্মক ঈশ্বরবাদই যুক্তি সঙ্গত কেন না জগতের কারণ যে জগৎ ছাড়া জলদমালার অন্তরালবর্ত্তী এক লোকোত্তর সম্রাট, এইরূপ ধারণা বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞব্যক্তির হৃদয়ে কিছুতেই স্থান পাইতে পারে না। আর যুক্তি যে ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বরকে অন্ধ বিশ্বাসীদিগের মানসদ্বীপে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে, ইহাও শিক্ষিত ব্যক্তির অবিদিত নহে। কাজেই যৌক্তিক বিচারে সগুণ ঈশ্বরের অর্থ অবিভক্ত অবস্থাপন্ন মায়া ও ব্রহ্ম চৈতন্য কেন না সর্ব্বাত্মক ঈশ্বর ঐরূপ মায়া ও ব্রহ্মের বিবরণ মাত্র এই ঈশ্বরের মহিমাই সবিশেষ ভাবে সংহিতা, ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে ঘোষিত হইয়াছে বিশেষতঃ সর্ব্বস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনাতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধকার দেখিতে হয় না এই জন্য যে, ইনি সম্মুখস্থ বা চতুর্দ্দিকবর্ত্তী প্রত্যক্ষ পদার্থ হইতে অতিরিক্ত নহেন আর

ইহাতেই বা আপত্তি করিবার কি আছে যে, অপ্রত্যক্ষ বস্তু সম্বন্ধে সন্দেহ কিছুতেই সমূলে বিধ্বস্ত হইবার নহে। যাঁহারা অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরে প্রেম ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিতে থাকেন, তাঁহাদিগের উভয়ই যে অপূর্ণ থাকিয়া যায় তাহার শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যুক্তি ও এই বিষয় দৃঢ়তর রূপে বুঝাইয়া দেয় সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে মহাকাশে লুক্কায়িত নিরাকার প্রভুর আসনে অতুল প্রেম দেখিতে যাওয়া যে কিদৃশ বিচার শীলতার কার্য্য তাহা ধারণা করিয়া উঠা দুষ্কর

কার্য্য কারণ ভাবের দিক দিয়া দেখিলে ইহাই সাব্যস্ত হয় যে উপাদান কারণ কার্য্য হইতে পৃথক বস্তু নহে কিন্তু ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বরবাদী প্রভুকে জগতের উপাদান কারণ না বলিয়া নিমিত্ত কারণই খ্যাপন করেন যেরূপ ঘটের কারণ কুম্ভকার ঘট হইতে পৃথক,— সেইরূপ জগতের নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর ও জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। বৈশেষিক দর্শনে যাহা অসমবায়ী কারণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে তাহা উপাদান কারণেই বর্ত্তমান থাকে এবং উহা গুণ বা ক্রিয়ার অন্তঃপাতী কাজেই ঈশ্বর স্বতন্ত্র বস্তু হওয়াতে তাঁহাকে অসমবায়ী কারণ বলা যায় না কিন্তু ঈশ্বরকে কুম্ভকারাদিবৎ নিরবচ্ছিন্ন নিমিত্ত কারণ বলাতে অপর উপাদান বা সমবায়ী কারণের আবশ্যকতা হইয়া পড়ে কেন না উপাদানের অভাবে জগতে কোন কার্য্যই দেখিতে পাওয়া যায় না এজন্য বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনে পরমাণুই জগতের সমবায়ী কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অবশ্যই এই দর্শন যুগলে ঈশ্বরকে নিমিত্ত কারণ বলিতে গিয়া পরমাণুকে উপাদান কারণ বলাতে সুবিবেচনার কার্য্যই হইয়াছে পরন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যে, তাঁহার নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া পড়ে তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত কেন না পরমাণু নিত্য ও অশেষ গুণ গ্রামের আধার। আর নিত্য বস্তুর গুণকে অনিত্যও বলা যাইতে পারে না সুতরাং পরমাণু বাদের ঈশ্বর যে পর-

মাণুর সাহায্য ভিক্ষা না করিয়া জগৎ সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারেন না ইহা প্রতিপন্ন না হইয়া রহিল না পক্ষান্তরে পৃথিবী ও অঙ্কুর প্রভৃতি বস্তু কোন কর্ত্তা হইতে উৎপন্ন নহে, যেহেতু চেতন শক্তি দ্বারা অগুনিত নিরীশ্বর বাদীর এই অনুমান ও এই স্থলে পরীক্ষণীয় রহিল।

প্রকৃত পক্ষে কার্য্যকরী হইলে কাহাকেও অকার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইতে দেখা যায় না সর্ব্বদা সতর্ক থাকিলেও অকস্মাৎ তাহা হইতে অন্যায় কার্য্য আত্ম লাভ করিয়া থাকে কাজেই বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বর বাদী প্রভুকে জগৎ কার্য্যে লিপ্ত করিতে গিয়া প্রকারান্তরে তাঁহার উপরে কলঙ্ক লাগাইয়া ফেলিয়াছেন যদিও ইঁহারা প্রভুকে নির্দ্দোষ রাখিবার জন্য সাবধানতার ক্রটি করেন নাই, তথাপি তাঁহাদের ভাগ্য দোষে নিরীশ্বর বাদীর নিকটে প্রভুর প্রচ্ছন্ন দোষ গুলি ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে অবশ্যই তাঁহারা যে পরমেশ্বরকে মানেন এই জন্য বিজ্ঞ সমাজে অবজ্ঞা ভাজন না হইলেও যখন তাঁহাদের নিযু্ক্তিক আগ্রহ ও অন্ধ বিশ্বাসের আবর্জ্জনার স্মরণ হয়, তখনই ঐ সমাজ তাঁহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হইয় থাকিতে পারে না কে না জানে যে নাস্তিকতা হইতে আস্তিকতা শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু সাম্প্রদায়িক গোড়ামি যে নিন্দনীয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই উহা দিন দিন আস্তিক সমাজকে যে, কিম্ভূত কিমাকার করিয়া তুলিতেছে, তাহার উদাহরণ পুনঃ পুনঃই দৃষ্ট হইয়া থাকে

মন নিরপেক্ষ ভাবে বহির্ব্বস্তুর অস্তিত্বের উপরে সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণের সুব্যাখ্যা নির্ভর করিতেছে। এই জন্য ঐ কারণ বাদীরা বাহ্য পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে প্রত্যয়ান্বিত পরন্তু যুক্তি অনুভব যখন বুঝাইয়া দিতেছে যে, এই সুবিশাল বিশ্বমণ্ডল মনের অপেক্ষা না রাখিয়া কখনও প্রতিপন্ন হইতে পারে না, তখন তাহার অজ্ঞাত সত্তায় বিশ্বাস করিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি আপনাকে অসুবিবেচক

বলিয়া পরিচয় দিতে যাইবেন কেন ? কিন্তু দেখিতেছি বিপরীত ; — অনেক বিজ্ঞ দার্শনিক ও অজ্ঞাত সত্তাকে ভিত্তি করিয়া বড় বড় পুথি লিখিয়াছেন ঐ সকল পুস্তকে যে ঐ সম্বন্ধে তাঁহারা কোন যুক্তি দেখান নাই তাহাও নহে পরন্তু সুষুপ্তিতে মনের বিলয়ে তদবস্থাপন্ন ব্যক্তির নিকটে কোন বস্তু অনুভূত হয়না এবং বস্তু জ্ঞানের পূর্ব্বে বা পরে বস্তুর অস্তিত্বের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না বলিয়া স্বতন্ত্র ভাবে বহির্বস্তুর অস্তিত্ব ও তদীয় অজ্ঞাত সত্তা কিরূপে স্বীকার করা যায় ? তবে আপ্ত বাক্যে বিশ্বাসের কথা স্বতন্ত্র। পরন্তু অনুভব যে যুক্তি অপেক্ষা বলবান এই বিষয়ে কেহই আপত্তি করিবেন না সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে গ্রন্থকার দিগের রচনা ভঙ্গি দেখিয়া আপন অনুভবের অবমাননা করা, কিপ্রকারে সুবিবেচনার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ? কেন না "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ কিম্বদন্তী আবহমান কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

মনে করা যাউক যে একই সময়ে নিখিল জীব সুষুপ্তিতে উপনীত হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ অবস্থাতে যে জগৎটা বিদ্যমান থাকে তাহার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় কি ? কেননা সকলেই অজ্ঞানের সূচিভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে "আমি জগৎ দেখিতেছি' এইরূপ বলিবার কেহই নাই। সুষুপ্তি হইতে জাগ্রৎ অবস্থায় আসিয়া জীব যে মনে করে তাহার সুষুপ্তি কালেও এই জগৎ বর্ত্তমান থাকে তাহার কারণ, তুল্যভাবে বস্তু জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি জনিত ভ্রান্তি মানুষ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বস্তু সমূহ বারম্বার দেখিতে পাওয়ায় এইরূপ মনে করাতে তাহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে না পারিলেও বিচারশীল বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারা যায় না কেন না প্রমাণের অভাবগ্রস্ত বিষয় মানিয়া লওয়াতে অবিবেকেরই পরিচয় প্রদান করা হয় এই প্রকারে পরিচারকাদি সহিত এক পরিব্রাজক সকলেই যদি

নিদ্রিত হয, এবং তাহাদেব সম্পত্তি কেহ দেখিবার না থাকে, তবে সেই সময উহাব অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওযা যায় না সুষুপ্তিব অবস্থা টাকে ভাবিযা দেখিলে মহা প্রলযেব তমোগুঢতমের কথা মনে পড়ে বোধ হয শাস্ত্রে মহা প্রলযের বচনাটা সুষুপ্তির আদর্শেই হইযাছে ব্যক্তিগত সুষুপ্তিব অনুভব কবিযা নিখিল জীবেব এক কালিন সুষুপ্তি কল্পিত হইযাছে কেন না একই সময়ে সকল প্রাণীগুলি যে অবিদ্যাব ক্রোড়ে শযান হইয়া পড়ে তাহাব কোন সন্তোষ জনক প্রমাণ পাওযা যায না তবে ধর্ম্ম গ্রন্থে বিবিধ ভঙ্গিতে ইহাব বর্ণনা দেখিতে পাওযা যায যাহাই হউক, সুষুপ্তি যে জীবেব দর্পহারী অবস্থা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই প্রতি দিন যদি এই অবস্থার বিষয ভাবিযা দেখা যায তাহা হইলে সংসারের সত্যতাভিনিবেশ জনিত প্রমাদ হইতে মন স্বতঃই নিবৃত্ত হইতে থাকে।

জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থাতে জীব স্বযং জগতের সৃষ্টি করিযা লয। কেননা জগৎ তাহার মনেবই সম্পত্তি গৃহ, দাবা উদ্যান ও সুবর্ণ মুদ্রা প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুই তাহার মনের পবিণাম বিশেষ মনই যেরূপ হিমাচলের অভ্রংলেহী উত্তুঙ্গ-হিমাবৃত্ত শৃঙ্গ, তদ্রূপ নীলিমময মহোদধির উৎফুল্লতরঙ্গ; হিবকখচিতহর্ম্ম্যতল ও তৃণাকীর্ণ তরুতল উভয়ই মন হইতে আত্ম লাভ করে এমন বস্তু নাই বলিলেই হয, যাহা মনেব অন্তঃপাতী নহে এইরূপে স্বযং প্রকাশ জ্ঞানকে বাদ দিযা অন্তর ও বাহিবেব সমস্ত পদার্থই যখন জীবেব আপন মনের সম্পত্তি তখন এই গুলিব স্রষ্টা বলিযা অপর কোন বস্তুকে মানিযা লওয়া কিপ্রকারে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জীব স্বযং জগতের রচনা করিয়া ও ইহাকে অপর হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করে যাহা তাহার আপন কৃতি প্রসূত, তাহার জন্য অপর রচযিতা কল্পনা করিয়া তাহাকে জানিবার তরে পাগল হইয়া

উঠে যদিও ইহাতে তাহার লাভ ব্যতীত অলাভ নাই তথাপি এইরূপ কার্য্যে বিচার বিমূঢ়তাই ব্যক্ত হইয়া পড়ে আর বিচার বিমূঢ়তাই যে মানুষকে অমানুষ করিয়া তুলে তাহাও অসত্য নহে। সুতরাং বিচারশীল ব্যক্তির পক্ষে সাবধান হওয়া উচিত যে, তিনি স্বকীয় সামগ্রিকে অপরের মনে না করেন তিনি অন্ধ গোলাখুল নীতিতে আপনার প্রকৃত অতুল সম্পত্তি ছাড়িয়া কৃত্রিম সম্পত্তির লোভে পরের পোষ্য পুত্র হইতে না যান অবশ্যই অবিদ্যা আসিয়া তাঁহাকে মোহন বেশে ভুলাইতে চাহিবে, কিন্তু বিচারের খরধার বাণাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পরিশেষে বাধ্য হইয়া তাহাকে অদৃশ্য হইতে হইবে।

এক এক করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় বন্ধ করিয়া ফেলিলে যখন গন্ধ, রূপ, রস, শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতি গুণ ও ক্রিয়া রাশি বিলুপ্ত হইয়া যায় তখন ঐ গুলিযে ইন্দ্রিয় বোধ মাত্র, ইহাতে কি সন্দেহ আছে ? আর গুণ ও ক্রিয়া গুলি যে বহির্জগতের বিশ্লেষণে সম্মুখে আসিয়া খাড়া হয়, তাহাই বা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কি প্রকারে অবিশ্বাস করিতে পারে ? মনে করা যাউক যে এক খানি ইষ্টককে ক্রম নীতিতে চূর্ণ করিয়া ফেলা যাইতেছে, ইহাতে বিভিন্ন আকৃতি, লাল বর্ণ, কঠিন বা কোমল স্পর্শ, আস্বাদন এবং উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ ও প্রসারণ প্রভৃতি ক্রিয়া বিশেষ ব্যতীত অপর কিছুই অনুভূত হইবার নহে এমন কি বহুমূল্যের সুসংস্কৃত অনুবিক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া দেখিলে ও প্রোক্ত গুণ ও ক্রিয়া গুলিই ধরা পড়ে যে কোন উপায় করা যাউক না কেন গুণ ও ক্রিয়ার গুর, কিছুতেই অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারা যায় না এইস্থলে অবশ্যই ইদানিন্তন বৈজ্ঞানিক মহোদয়গণ অতি পরমাণুর শরণ লইবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের অতিপরমাণু অতীন্দ্রিয় সুতরাং অজ্ঞেয়তার ঘন তিমির জালে আবৃত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যখন বিচারে ঐ গুলি ইন্দ্রিয় বোধ বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তখন এই বিশাল বিশ্বমণ্ডলকে

কি প্রকারে জীবের আপন সম্পত্তি না বলিয়া থাকিতে পারা যায় এবং কি প্রকারেই বা উহাকে মেঘ মালায় অন্তরালবর্ত্তী অমানুষিক সম্রাটের রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে বিচারশীল ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয়। যেরূপেই পরীক্ষা করা যায় না কেন, জীবের প্রতীয়মান কোন বস্তু অপরের বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার নহে রাম শ্যামের সম্বন্ধে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, আকৃতি ও চেষ্টা প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতেছে তাহা রামের আপন ইন্দ্রিয় বোধ এই রূপে শ্যামের বিচার বুদ্ধি, সুশীলতা ও উদার ভাব সম্বন্ধে, সে যাহা অনুমাণ করিতেছে, তাহা তাহার মনোবোধ ছাড়া অন্য বস্তু নহে চেতন বা অচেতন, যে কোন জিনিষ সম্বন্ধে এইরূপ প্রণালীতে ভাবা যায়, তাহাই জীবের আপন ইন্দ্রিয় বোধ বা মনোবোধে পরিণত হইয়া পড়ে কেবল বিচারের বৈগুণ্যে বা বৈপরীত্যে আপন মনোবোধ ও ইন্দ্রিয়বোধ হইতে ভিন্নরূপে বস্তুর কল্পনা করিয়া জীব আপনাকে আপনি দৃঢ় বন্ধনে বাঁধে।

এই স্থলে নানাজীববাদী বলিয়া উঠিতে পারেন যে, যখন আপনার ন্যায় চেতনা শক্তি জনিত কার্য্য কলাপ অপরেরও দেখিতে পাওয়া যায় তখন তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে কি সন্দেহ আছে? কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে নানাজীববাদী যে কার্য্য কলাপকে অপরের চেতনা শক্তি জনিত মনে করেন, তাহা তাঁহারই চেতনা শক্তি প্রসূত ইন্দ্রিয় বোধ বা মনোবোধ হইয়া দাঁড়ায় কেননা নিজের ঐ উভয় বোধ বন্ধ হইলে অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় কোন জিনিষই জানিতে পারা যায় না কাজেই মানুষের আপন ঐ বোধ যুগলই অবিদ্যার কারুকার্য্যে অপরের হইয়া দাঁড়ায়। যদিও মানুষ আপন চেষ্টা প্রভৃতিকে, স্বতন্ত্র চেতনাশক্তি জনিত অনুভব করিয়া তৎসাদৃশ্যে অপরের চেষ্টা প্রভৃতিকেও স্বতন্ত্র চেতনা শক্তির কার্য্য বলিয়া কল্পনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি বিচারে উহার মূলে ভ্রান্তি জ্ঞানই ধরা পড়ে এইরূপে যখন

এক জীব অপর জীবের কিছুই বুঝিতে পারে না, এবং যাহা তাহার প্রতীয়মান হয় তাহাও তাহার আপনার, তখন জানিতে বাকি রহিল না যে অপর জীব তাহারই কল্পনা বিজৃম্ভিত কেননা স্বপ্ন অবস্থাতে একই জীব শত শত অপর জীব কল্পনা করিয়া লয় ঐ অবস্থাতে এক দৈন্যদশাপন্ন কৃষক ও সহস্র সহস্র প্রজার রচনা করিয়া তাহাদের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া বসে হস্তি ঘোটক প্রভৃতি চেতন উপকরণ সমূহ ও সে নিমেষের মধ্যে নির্ম্মাণ করিয়া লয় সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে একই জীবকে তাহার প্রতীয়মান অন্যান্য জীবের স্রষ্টা বলিলে কোনও দোষ আসিবার নহে পরন্তু মানুষ ভ্রান্তি প্রণোদিত হইয়া নানা জীবের অস্তিত্বে এত বিশ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে প্রমাণ না পাইয়াও একজীববাদীর কথায় অবহেলা করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতের দল উপহাস ও সুবিধামত লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ দ্বারা ও একজীববাদীর খবর লইয়া থাকে শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য সমাজ, বাহিরে অশ্রাব্য শব্দের প্রয়োগ বা কোনরূপ আঙ্গিক অপব্যবহার না করিলেও লেখনী দ্বারা বা মনে মনে একজীব-বাদকে উন্মত্তের প্রলাপে পরিণত করিতে ছাড়েন না

যাহাই হউক একজীববাদ যখন বেদান্তের মুখ্য সিদ্ধান্ত ও বড় বড় মহাপুরুষের অনুভূত এবং অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; তখন এইরূপ ব্যাপারে ভীত হইবার কোন কারণ নাই আর প্রতিদিনের সুষুপ্তির অবস্থাটাই বুঝাইয়া দেয় যে, কারণ অবস্থাতে জীবের নানাত্ব বা ভিন্নত্ব কিছুতেই ধরিয়া লইতে পারা যায় না কার্য্য অবস্থাতে অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থাতে "অন্তঃকরণ" এবং শরীর প্রভৃতি উপাধিকে পৃথক পৃথক রূপে ধরিয়া লইতে পারিলে ও চৈতন্য গত কোন পার্থক্য ধরা পড়ে না ঐ অবস্থাতে উপেনের চেতনা শক্তি ঈষৎ অলক্ত মিশ্রিত দুগ্ধের ন্যায় এবং নরেশের চেতনা শক্তি পাটল

বর্ণের, এইরূপ বলাতে মস্তিষ্কের বিকৃতিই সূচিত হইয়া থাকে কেননা চেতনা শক্তি সকল অবস্থাতেই একরূপ ও অখণ্ড কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়ও নানা চেতনা শক্তি কল্পনা করিয়া অপনার বিচার বৈকল্য ব্যক্ত করিতে ছাড়েন না।

বৈদান্তিক কৃতবিদ্য সমাজে নানাজীববাদ ও একজীববাদের বিবাদ থাকিলে ও জীবের প্রকৃত স্বরূপ যে এক অখণ্ড ব্রহ্ম এই বিষয়ে কোন বিসম্বাদ নাই কেননা সকল বৈদান্তিক মহাপুরুষই এক বাক্যে ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন বা আসিয়াছেন যে, ব্রহ্মই অবিদ্যা উপাধিযোগে জীব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন কাজেই মায়িক বা নকল ভাগটার জীবগত পরস্পর পার্থক্য খুঁজিয়া পাইলেও মূল ব্রহ্ম অংশে লেশ মাত্রও উহা দেখিতে পাওয়া যায় না অধিকন্তু এই মায়িক ভাগটার পার্থক্য ও কার্য্য অবস্থাতে অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থাতেই ধরা পড়ে কেননা সুষুপ্তিরূপ কারণ অবস্থাতে রাম, শ্যাম, যদু ও গোপাল প্রভৃতি সকলেই এক ভাবের হইয়া দাঁড়ায় এমন কি, মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত ঐ অবস্থাতে পরস্পর এক ভাবাপন্ন হইয়া উঠে, সুতরাং নানা জীববাদের বাহাদুরী লইয়া কি প্রকারে লেখনী চালনা করিতে পারা যায়

জড় ও চেতন সমস্ত বস্তু গুলিই যখন জীবের ইন্দ্রিয় বোধ বা মনোবোধরূপ, তখন ইহা প্রতিপন্ন হইতে বাকি রহিলনা যে, জীব স্বয়ংই তাহার প্রতীয়মান জগতের স্রষ্টা যদিও অজ্ঞান দৃষ্টিতে অসংখ্য জীবের সৃষ্টি ও অসংখ্য হইয়া উঠে, তথাপি একের সৃষ্টির খবর অপরে পায় না যদু অবশ্যই মনে করিতে পারে যে, গোপালও তাহার মত স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি রচনা করিতে পারে, কিন্তু মনে করিবার সমস্ত উপকরণ গুলিই যদুর নিজের জিনিষ আর এইরূপ মনে করাটা যে একটা অভিনব বিষয় অহা নহে এই জন্য যে, মানুষ মাত্রকেই

ইহাতে সবিশেষ ভাবে অভ্যস্ত হইতে দেখা যায়। এমন কি জ্ঞানী ও অজ্ঞান অবস্থার সংস্কারের বেগে এইরূপ অভ্যাসকে সমূলে উচ্ছিন্ন করিতে পারেন না। সমাধিস্থ না হইতে পারিলে জ্ঞানীকে অন্ততঃ অজ্ঞাতসারে নানাজীব কল্পনা করিতেই হইবে এই জন্যই বীতরাগ মহাপুরুষেরা নানাত্ব প্রতীতির দায় ঘুচাইবার জন্য চির সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া যান। অবশ্যই ব্যুত্থান অবস্থাতে তত্ত্বদর্শী ও এই প্রকার প্রতীতির জঞ্জাল সর্ব্বথা অতিক্রম করিতে পারেন না কিন্তু অজ্ঞানীর ন্যায় প্রতীয়মান বস্তুতে তাঁহাদিগের সত্যতাভিনিবেশ হইতে দেখা যায় না প্রতীয়মান বস্তুগুলি ব্রহ্ম সত্তা হইতে স্বতন্ত্র সত্তাশূন্য সুতরাং অসত্য, এইরূপ ধারণার অপলাপ জ্ঞানীর কখনও হইতে পারে না, কেননা তিনি অনেকত্বের প্রত্যক্ষত উপলব্ধি করিয়াও তাহার মূলে একত্বই দেখিতে পান এমন কি সময়ে সময়ে তিনি এমনভাবে একীত্বে বিলীন হইয়া পড়েন যে, অনেকত্বকে ধরিয়া উঠিতেই পারেন না যাহাই হউক আমার প্রতীয়মান জগৎটা যখন আমারই কল্পিত, তখন কি প্রকারে তাহার একটা অপর স্রষ্টা কল্পনা করিয়া বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় দিতে পারা যায় অমোঘ দার্শনিক যুক্তি যদি নিজের ইন্দ্রিয় বোধ বা মনোবোধ ছাড়া জগতের অপর কোন সুব্যাখ্যা দিতে পারিত, তবে আপনাকে বাদ দিয়া অপর কোন স্রষ্টা মানাতে অবিবেচনার কার্য্য না হইয়া সুবিবেচনার কার্য্যই হইত। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া চলাতে যে, বিচারশীলের কার্য্য হইতে পারে, দার্শনিক বুদ্ধি তাহা কিছুতেই ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না।

জীব নিজের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারেনা বলিয়াই যে জগতের এক যথেচ্ছাচারী লোকোত্তর সম্রাট মানিতে হইবে ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে যেহেতু ইহার উদাহরণ আজ পর্য্যন্তও লোকলোচনের

অগোচরেই রহিয়াছে এইরূপে জীবকে অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান ও আপদ বিপদ সঙ্কুল দেখিয়া, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও অব্যর্থ কৃতির আধার বলিয়া প্রভুবে প্রথিত করাতেও সুবিবেচনার কার্য্য হয় না, কারণ ইহারও কোন নিদর্শন নাই পক্ষান্তরে যোগ ও সাধন বলে মানুষ যে অসম্ভবকেও সুসম্ভব করিয়া তুলে তাহার কথা বড় বড় পুথিতেই রহিয়াছে কাজেই পুথির উপর নির্ভর করিয়া চলিলেও জীবকে জগন্নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অকর্ম্মণ্য সাব্যস্ত করিতে পারা যায় না। আর ন্যায় সূত্রের ভাষ্যকার যে "তৎকারিতত্বাদহেতুঃ" সূত্রের ভাষ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে সাধন সিদ্ধ পুরুষই ঈশ্বর শব্দের প্রবৃত্তি নিমিত্ত তবে তাঁহাকে বৌদ্ধ ভাবের চাণক্য বলিয়া উড়াইয়া দিবার কথা স্বতন্ত্র পরন্তু "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্যবা" ভক্ত মণ্ডলীর নিকট এই কপিল সূত্রের যে কি গতি হইবে তাহাও ধারণা করিয়া উঠিতে পারা যায় না কারণ তাঁহারা কপিল মুনিকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়াই জানেন অপিচ যোগ সূত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে যোগ বলে মানুষের যে ঈশ্বরীয় শক্তির আবির্ভাব হয় তাহার অনেকানেক কথা রহিয়াছে, সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে জীবকে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্ত্তা শিব বলিয়া প্রথিত করিলে সবিশেষ অপরাধ হইবার নহে অতএব নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, আমিই আমার প্রতীয়মান জগতের স্রষ্টা

জগতের প্রকৃত স্বরূপ কি ?

যে জগৎ লইয়া বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি, ঐতিহাসিক, ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রভৃতি হুলু স্থুলু ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি, এই প্রশ্ন যে চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে স্বতঃই উদিত হইবে,

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে অমার্জ্জিত বুদ্ধি কৃষিবল কিম্বা বাজার সরকার, অথবা তাহাদের সমকক্ষতাপন্ন অপর অনভিজ্ঞের দল যদিও এই বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতে যায় না, তথাপি মার্জ্জিত বুদ্ধি নব্য শিক্ষিত সমাজের এ বিষয়ে ঔদাসীন্য বা তটস্থতা দেখিতে পাওয়া যায় না তাঁহারা অপরা বিদ্যার প্রভাবে জগতের আসল স্বরূপকে ধরিয়া লইতে না পারিলেও যাহা তাঁহাদের ইন্দ্রিয় বেদ্য হইয়া থাকে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না কাজেই জগতের প্রকৃত স্বরূপকে তাঁহারা অতীন্দ্রিয় উপাধি প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে জগতের প্রকৃত স্বরূপকে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা ধরিয়া লইতে পারা যায় না এই মতের এই অংশে আপত্তি করিবার কিছু না থাকিলেও অপরাপর অংশে একমত হইবার উপায় নাই যাহ হউক, তাঁহারা যে জগতের আসল স্বরূপের অন্বেষণে রহিয়াছেন ইহা তাঁহাদের পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে কেননা মাত্রাস্পর্শে বিমোহিত না হওয়া সহজ কার্য্য নহে এবং ইহা মনস্বিতারও সূচনা করিয়া দেয় আর অমনস্বী-দিগের যে বর্ণরতি ও স্পর্শরতি প্রভৃতি উপজীব্য, তাহারও উদাহরণ সচরাচর পাওয়া যায়। কাজেই অবনী মণ্ডলে যিনি ইন্দ্রিবেদ্য বস্তুর মোহে পতিত না হইয়াছেন এমন লোক অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে এমন কি শৃঙ্গী ঋষির ন্যায় মহাপুরুষকেও এইরূপ মোহে চলিয়া পড়িতে হইয়াছিল।

নব্য সমাজের উদ্দেশ্য অবশ্যই মহান্, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যের প্রণালী ও উপকরণ গুলির প্রতি মনঃসংযোগ করিলে নৈরাশ্যের অন্ধকার কিছুতেই অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারা যায়না কেননা অবিরাম বহির্ব্বস্তু লইয়া ব্যস্ত থাকিলে অন্তরতম তত্ত্বকে যে ধরিয়া উঠিতে পারা যায় এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তবে তাঁহাদের অসামান্য অনুষ্ঠান হইতে সংসারের অনেক উপকার হইয়াছে। যদিও

এই উপকার হইতে বিলাসিতা আসিয়া মানুষকে নবনীতের প্রতিমার ন্যায় সুকুমার করিয়া তুলিতেছে, তথাপি আপাত দৃষ্টিতে ইহা শ্লাঘনীয় বলিয়াই বোধ হয় কেননা অবিশেষ দর্শন অবস্থাতে মানুষ পার্থিব সুখকেই যথেষ্ট মনে করিয়া থাকে বর্ত্তমান সময়ে যে দেশে বা যে জাতিতে এই সুখ ভোগের সাধন স্বচ্ছল ও উন্নত সেই দেশ ও সেই জাতি মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই দেশ ও সেই জাতির রীতি নীতির অনুকরণ করিতেও অপর দেশবাসীরা প্রস্তুত সুতরাং যে বিদ্যা হইতে মানুষ এই সুখের সপ্তম স্বর্গে না হউক অন্ততঃ প্রথম স্বর্গেও পৌঁছিতে না পারে, সেই বিদ্যা জনসাধারণের প্রীতি আকর্ষণে যেন অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে আর ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া সময় ব্যয় করিতেও নব্য শিক্ষিত সমাজের সুযোগ ঘটিয়া উঠা দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে নিরন্তর প্রাকৃতিক বিষয় লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকাই ইহার প্রধান কারণ যদিও এই সমাজের মুষ্টিমেয় লোককে ধর্ম্ম লইয়াও আলোচনা করিতে দেখা যায়, তথাপি এইজন্য তাঁহাদিগকে সমকক্ষ শ্রেণীর নিকটে গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। অনেক স্থলে এইরূপও দেখা যায় যে দৈবযোগে বা সাময়িক উত্তেজনায় যদি যুবক পুত্র কোন ধর্ম্ম গ্রন্থের পত্র উদ্‌ঘাটন করিতে যান, তবে পিতার তিরস্কার ভোগ না করিয়া থাকিতে পারেন না এইরূপ অবস্থাতে প্রেমের সুগম বর্ত্ম উপেক্ষা করিয়া শ্রেয়ের বন্ধুর পথে যে মানুষ পদার্পণ করিবে ইহাতে বিশ্বাস করিতে না পারিলেও আশার আবির্ভাব হয় কেননা দেখিতে পাই যে জন সমাজে পার্থিব সুখভোগের লালসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও উন্নতি হইতেছে অবশ্যই এই উন্নতি অন্তিম সীমায় যাইয়া তাঁহাদের গতি ফিরাইয়া দিবে তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাকৃতিক সুখ অপেক্ষা ও অপর কোন অপ্রাকৃত মহান সুখ আছে। এইস্থলে ইহাও সবিশেষ ভাবে বিবেচনা করা উচিত যে,

মানুষ চিরদিন এক বিষয় অধিকার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। নূতন বস্তুর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে স্বতঃই জাগিয়া উঠে। কাজেই প্রাকৃতিক সুখ ও তাহার সাধন প্রাকৃত বিদ্যার নিরঙ্কুশ রাজত্বের অবসানও কালে হইবে সভ্য দেশীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বিলাসিতার প্রতি অশ্রদ্ধা ব্যাপারটাও ইহাই বুঝাইয়া দেয়।

প্রাকৃতিক সুখ ভোগের লালসা এবং প্রাকৃত বিদ্যার গোড়ামির মাত্রা না কমিলে কিছুতেই মানুষ জগতের আসল স্বরূপের সহিত পরিচিত হইতে পারে না কেননা উভয়ের সহিত অবিদ্যার ঘনিষ্ঠতা অধিক হওয়াতে এই অবসরে তিনি আসিয়া মনে আসন জমাইয়া লন, এবং মোহন মন্ত্রের উচ্চারণ পূর্ব্বক আপনার উদ্ভাবিত নকল স্বরূপ দেখাইয়া মানুষকে ভুলাইয়া ফেলেন অর্থাৎ উভয়ের প্রাধান্য থাকিলে মানুষ অবিদ্যার ষড়যন্ত্রে পড়িয়া জগতের মায়িক স্বরূপের সীমা অতিক্রম করিয়া আসল স্বরূপের দিকে যাইতে পারে না এই জন্যই ঋষিযুগে উভয়ের তত সমাদর ছিল না। সেই যুগে কেহ বৈদ্যুতিক পাঁখা ও মোটর গাড়ি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ভোগোপকরণ সংগ্রহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইত না,—কিন্তু আকাশগামী তিন চক্রের গাড়িতে বসিয়াই সন্তুষ্ট হইত যদিও ঋষিগণ বর্ত্তমান অসভ্য বা বন্য লোকের ন্যায় বৃক্ষতলে বা তৃণশালায় অবস্থিতি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন তথাপি তাঁহাদের উদার প্রশান্ত অন্তঃকরণের প্রতিযোগিতা করিতে পারে এমন মন বর্ত্তমান যুগে বিরলই হইয়া পড়িয়াছে এই সম্বন্ধে মোটের উপর ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্ত্তমান সভ্যতা বহির্মুখী আর আর্য সভ্যতা অন্তর্মুখী যদিও উভয় সভ্যতার সমীকরণেই মানব সমাজের পরম হিতকারিণী পূর্ণ সভ্যতার আবির্ভাব হইতে পারে, তথাপি বর্ত্তমান সভ্যতা অপেক্ষা আর্য সভ্যতার যুগে যে সাধারণ লোক সুখ স্বচ্ছন্দে ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ

তাঁহাদিগের সময়ে জনসাধারণের মধ্যে ভোগ লিপ্সা এত প্রবল ছিল না ভোগ সুখের স্পৃহা শূন্য পরম জ্ঞানী ঋষিগণ সমাজের কেন্দ্রস্থলে আলোক স্তম্ভ স্বরূপে দণ্ডায়মান থাকিতেন তাঁহাদের জ্ঞানালোকে সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দ—ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলেই শান্তির পথে যাইতে চেষ্টা করিত, কাজেই ভোগবাসনা আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, পাশবিক ভাবের বাহুল্য ছিল না সুতরাং অন্তঃসভ্যতাকে প্রধান লক্ষ্যস্থানে রাখিয়া বহিঃসভ্যতা তাহার সাধনরূপ মনে করাই বিজ্ঞতার কার্য্য এই জন্য যে, প্রথমের পশুভাব সহভাবিত্ব এই প্রণালীতে মিটিয়া যায় আর ইদানিন্তন বহিঃসভ্যতা যে প্রকারান্তরে পশু ভাবেরই শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে তাহাও বিবেক চক্ষে ধরা না পড়িয়া থাকে না ইন্দ্রিয় সন্তর্পণ বিবেকি সমাজে পশুভাব বলিয়া পরিগণিত হইলেও উহাই বর্ত্তমান সভ্যশ্রেণীর প্রধান লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়িয়াছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার, রাজনৈতিক বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রায় তাত্ত্বিক গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্যের বস্তু তত্ত্ব ভাবিয়া দেখিলে ছদ্মবেশে বা অলঙ্কৃত বেশে ইহাই আসিয়া বিচারশীল ব্যক্তির মনে সমুপস্থিত হয় অবশ্যই ইহাকে দেবভাবের পরিচ্ছদ পরাইয়া লোক লোচন গোচর করিতে সভ্য সমাজ কুণ্ঠিত নহেন, কিন্তু সাধারণে ইহা বুঝিতে না পারিলেও সুযোগ্য পরীক্ষক কিছুতেই প্রবঞ্চিত হন না অপরিণামদর্শী বা আপাতদর্শী ব্যক্তি ইহাকে দেবভাব বলিয়াই স্থির করিয়া লইয়াছেন যাহাই হউক, বর্ত্তমান পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া দেবভাব যে সপ্তম স্বর্গের শরণ লইয়াছে ইহা কল্পনা হইলেও অসার কল্পনা নহে

জাগতিক পদার্থের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় কেবল গুণেরই বিবিধত্ব দেখিতে পাওয়া যায় গুণছাড়া একটা

অতিরিক্ত পদার্থ যে আছে ইহা পরীক্ষায় অমূলক হইয়া দাঁড়ায়। কেননা উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ধরা পড়ে না, যাহা এই জ্ঞানের গোচর হয় তাহা গুণ ও ক্রিয়ার অন্তর্ভব অবয়ব ও অবয়বী বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ আছে উহাও গুণাতিরিক্ত নহে, এইজন্য ইন্দ্রিয়বেদ্য বা মনোবেদ্য জাগতিক বস্তু গুণ ও ক্রিয়া ব্যতীত অপর জিনিষ প্রতিপন্ন হয় না সুতরাং বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতে গুণেরই রাজত্ব প্রথমে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও পরিমাণ প্রভৃতি লীলা খেলা করিতেছে আর দ্বিতীয়ে সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া প্রত্যেকেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে যেরূপেই পরীক্ষা করা যাউক না কেন বহির্জগতের আনুরূপ্যেই অন্তর্জগতে কেবল গুণের ছবি দেখিতে পাওয়া যায় তবে ইহা সত্য যে বাহ্য জগতে যেরূপ গুণের সহিত ক্রিয়ারও লীলা রস রঙ্গ অনুভূত হয়, সেইরূপ অন্তর্জগতে নহে যদিও স্বপ্ন অবস্থায় গুণের ন্যায় ক্রিয়ার ও অদম্য প্রতাপ দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি ঐ অবস্থাতে স্বতন্ত্রভাবে মানুষ বহির্জগতের কল্পনা করিয়া লয় এই প্রণালীতে জাগ্রৎ অবস্থার জগৎটাও অবশ্যই মনের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায় তথাপি অজ্ঞানী পরিতোষ নীতিতে আপাততঃ জাগ্রৎ জগৎটাকে স্বপ্ন জগৎ হইতে বিলক্ষণ রূপেই ধরিয়া লওয়া যাইতেছে আর যাঁহারা উভয় জগতের বাস্তবিক বিভিন্নতা স্বীকার করেন, তাঁহারাও গুণ এবং ক্রিয়ার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া উঠিতে পারেন না।

মহামায়ার রাজ্যে গুণ ও ক্রিয়া ব্যতীত কোন জিনিষ প্রমাণিত হইবার নহে। কেবল বিচার বৈপরীত্যে মানুষ গুণের সঙ্ঘকেই গুণাতিরিক্ত দ্রব্য বা বস্তু বলিয়া বুঝিয়া যায় বাগের সম্মুখে যে সুবৃহৎ বটবৃক্ষ খাড়া রহিয়াছে উহার তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিলেও গুণ এবং ক্রিয়া ছাড়া কিছুই ধরা পড়িবেনা শ্রেষ্ঠী

মহাশয়ের শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত ভবনগুলিও এরূপ ব্যাপারে গুণ ও ক্রিয়াতেই পরিণত হইয়া পড়ে এমন কি সম্রাটবৃন্দের অতুলনীয় প্রাসাদরাজিও এই প্রণালীর পরীক্ষায় গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি বলিয়াই সাব্যস্ত হয় কাজেই এইরূপ অবস্থায় উভয়ের অতিরিক্ত একটি দ্রব্যও প্রতীতি গোচর হয় না এই ধারণাটাকেইবা কিপ্রকারে অপ্রমা বিজৃম্ভিত না বলিয়া পারা যায় গুণ ও গুণী যুগ্মভাবে বর্ত্তমান থাকে এরূপ কথিত হইলেও পরীক্ষায় যখন অতিরিক্ত গুণীর কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয়না তখন ইহাকে আপ্ত বাক্য বলা যাইতে পারেনা। আর গুণ ও ক্রিয়া যে নিরাধার হইয়া থাকিতে পারেনা ইহাকে সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লইলেও কোন জড় আধার প্রমাণিত হইবার নহে এইজন্য যে, উহা অতীন্দ্রিয় হওয়াতে জ্ঞেয়তার চক্ষুঃসীমার বাহিরেই রহিয়াছে যদ্যপি ব্রহ্মাত্মাকে ও অতীন্দ্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ দেখা যায়, তথাপি উহা স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ হওয়াতে মনোবৃত্তির সাক্ষীরূপে স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে জড় বস্তুকে স্বপ্রকাশ মানিলে তাহার জড়ত্বই অদৃশ্য হইয়া যায়; কেননা যাহা স্বয়ং প্রকাশ ~~হইতে~~ হইয়া অপরের দ্বারা প্রকাশিত তাহাই জড় শব্দের প্রতিপাদ্য, কাজেই অতীন্দ্রিয় জড়, অতিপরমাণু, পরমাণু বা অণুকে ও গুণ এবং ক্রিয়ার আধার কল্পনা করিতে পারা যায় না। আর গুণ ও ক্রিয়া, তাহার চিন্ময় সাক্ষীরূপ আধারের পরিচয় না দিয়া ঐ কিম্ভূত কিমাকার আধারের পরিচয় দেয়না এই জন্য যে, এইরূপ সাক্ষী না থাকিলে উভয়ের প্রতিপন্ন হওয়াই দুর্ঘট হইয়া উঠে কেননা প্রত্যেক বস্তুই প্রতিপন্ন হইতে যাইয়া চেতন সাক্ষীর উপর নির্ভর করে। কোন চেতন সাক্ষী নাই কিন্তু জড় আছে এইরূপ উক্তি বিজ্ঞ সমাজে প্রলাপোক্তি বলিয়াই খ্যাতি লাভ করে অতএব প্রাপ্তাপ্রাপ্ত বিবেক নীতির অবমাননা পূর্ব্বক আবশ্যকীয় সাক্ষীকে উপেক্ষা করিয়া অতি

পরমাণুর শরণে যাওয়া, বিবেকানুমোদিত কার্য্য বলিয়া গ্রথিত হইতে পারে না।

আমরা যে কোন জিনিষ অনুভব করি উহাই জ্ঞানে প্রতিভাসিত এমন বস্তু নাই বলিলেই হয় যাহা জ্ঞানের চাঁদনীতে আলোকিত নহে ; এই চাঁদনীকে এরূপও বলা যাইতে পারেনা যে, ইহা কখন আছে কখন নাই, এবং সকল জিনিষে এক ভাবাপন্ন নহে। কেননা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়া ইহা প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যেক অংশেই অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে কোন ক্ষুদ্র বস্তুকে সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করিলেও প্রত্যেক অংশে একই ভাবে জ্ঞানের ব্যাপ্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে। যখন প্রত্যেক বস্তু সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তখন ইহাকে বস্তুর স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত কিপ্রকারে বলা যায় ? বস্তুর যে যে অংশ বিশ্লেষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ঐগুলি মায়িক হওয়াতে প্রকৃত স্বরূপ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না যাহা অপরিবর্ত্তনীয়, অখণ্ড ও একভাবাপন্ন তাহাকেই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বলা সুবিবেচনার কর্ম্ম ; বিশেষতঃ এই লক্ষণগুলি যখন একমাত্র জ্ঞানেই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জ্ঞানকেই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া সাব্যস্ত করা যুক্তি সঙ্গত। জ্ঞান যে মস্তকের ভিতর থাকিয়া নিজের বা[illegible] প্রভৃতির মহিমায় বহিঃস্থ জিনিষ গুলিকে ধরিয়া লয় এই ধারণাটাকে কোনও প্রকারেই দার্শনিক ধারণা বলা যায় না কারণ ইহাতে জ্ঞানের যুক্তি-যুক্ত নিত্যতা ও অখণ্ড ব্যাপ্তির অপলাপ হইয়া পড়ে। তবে যে বিষয়ের পরিবর্ত্তনে জ্ঞানও পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া মনে হইয়া থাকে উহার মূলে বিষয় ও বিষয়ীর অন্যোন্যাধ্যাস রহিয়াছে এই নৈসর্গিক অধ্যাসের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া অনাদিকাল হইতে মানুষ সত্যের অপলাপ ও অসত্যের সমাদর করিয়া আসিতেছে।

প্রতীয়মান বস্তুর আসল স্বরূপ যে জ্ঞান ইহা তাহার মায়িক অংশের

ক্ষণ ভঙ্গুরতাও বুঝাইয়া দেয়। মনে করা যাউক যে চলন্ত বাষ্পীয়যানে কেহ বহির্দৃশ্য দেখিতেছেন, একদৃশ্য দেখিবার পরক্ষণেই অপর দৃশ্য নেত্র-পথবর্ত্তী হওয়ায় কোন দৃশ্যই তাঁহার স্থায়ীভাবে দৃষ্টি গোচর হয় না। একবস্তু দর্শন করিতে না করিতেই অমনি অপর দৃশ্যের আবির্ভাব হইতেছে এই দৃশ্য গুলির আবির্ভাবও তিরোভাব এতদ্রুত হইতেছে যে ঐ গুলির কোন অবস্থাই তাঁহার বিদিত হইতেছেনা, সুতরাং উহা তাঁহার পক্ষে নাই বলিলেও চলে এইরূপ স্থলে প্রতীয়মান বস্তু যে ক্ষণভঙ্গুর তাহা বুঝিতে কোন প্রয়াস না হইলেও তুল্যভাবে বস্তুজ্ঞানের পুনরাবৃত্তি স্থলে অর্থাৎ যে স্থলে একই রূপে বস্তু বারম্বার অনুভূতি গোচর হয় সেই স্থলে বস্তুর ক্ষণভঙ্গুরতা সহজে ধরিয়া লইতে পারা যায় না পক্ষান্তরে যোগাচার বৌদ্ধের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুরতাকে বস্তুত্বের নিয়ামক বলিলে জ্ঞানীদিগের অনুভব ও বিজ্ঞমণ্ডলীর বিবেচনা দ্বারা যাহা বহুদিন হইতে সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে সেই অখণ্ড চির অমর জ্ঞানের যেরূপ অপলাপ হইয়া যায় সেইরূপ বস্তুরও কোন মূল্য থাকে না কেননা ঐরূপ জিনিষকে সকলেই অগ্রাহ্য করে। কাজেই অপ্রবুদ্ধ সমাজ, বস্তুর মায়িক অংশকে জ্ঞানীর ন্যায় যদি ক্ষণ-বিনাশী মনে করিত, তবে কখনও তাহাকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া বন্ধনের অরুন্তুদ যাতনা ভোগ করিত না যদিও অজ্ঞান অবস্থাতে মানুষ বস্তুর মায়িক অংশ ও চিদংশকে অন্যোন্যাধ্যাসের প্রভাবে একাকার করিয়া লয় বা চিদংশকে মায়িক অংশে পরিণত করিয়া ফেলে, তথাপি প্রথমের মহিমা একবারে ভুলিয়া যায় না এই জন্য যে, মায়িক অংশে উহার সত্যত্ব ও স্থায়িত্ব আরোপিত হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ অজ্ঞানী বিষয়কে সত্য ও স্থায়ী বলিয়া মনে করে এইজন্য যে, সে জ্ঞানের ধর্ম্ম বিষয়ে আরোপ করে। এইরূপ জ্ঞানকে অস্থায়ী ও অনিত্য মনে করাতেও ঐ অধ্যাসের কারুকার্য্যই ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

যেরূপ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ীকে ধরিতে না পারিয়া মানুষ বিষয়কেই সর্ব্বস্ব মনে করে, তদ্রূপ উভয়ের স্বরূপকে বিপরীতভাবে বুঝিবার অপরাধ হইতেও পরিত্রাণ পাইতে পারে না কেননা শিষ্ট সমাজে জড় বিষয়কে স্থায়িভাবে সত্য এবং চিন্ময় বিষয়ীকে অনিত্য মনে করা অসামান্য অপরাধ বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। যাহাই হউক এই বিষয়ীকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে না পারায় যে জগতে অন্ধ গোলাঙ্গুল নীতিই চলিতেছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু বিচারশীল মহোদয়গণও যদি ইহাতে অঙ্গ ঢালিয়া দেন, তবে বড়ই লজ্জার কথা। কেননা তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়াই অপর লোক জীবনযাত্রায় অগ্রসর হইয়া থাকে কাজেই তাঁহাদিগকেই প্রথমে এই অনর্থকরী নীতির উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। আর ইহাও অসত্য নহে যে বস্তুর দার্শনিক বিশ্লেষণে যথাযথ-রূপে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া উঠিলে ক্রমনীতিতে মানুষ উহার আসল স্বরূপের সহিত পরিচিত হইতে পারে। কেননা কেবল মায়িক অংশের উপর নির্ভর করিয়া দার্শনিক কখনও বস্তু বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন না, কিন্তু যিনি হন তাঁহাকে দার্শনিক না বলিয়া দর্শনাপলাপী উপাধিতেই ভূষিত করা কর্ত্তব্য যদিও বৈজ্ঞানিক-দিগের বৈজ্ঞানিকের অভিমত আসল স্বরূপ ধরা পড়ে এইরূপ শুনা যায়, তথাপি ঐ আসল স্বরূপটা অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহার ধরা পড়াকে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে। পক্ষান্তরে দার্শনিক আসল স্বরূপ স্বয়ং প্রকাশ হওয়াতে স্বতঃই অপরোক্ষ, এই জন্যই উহা বুঝিয়া লইতে সবিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না তবে ইহা অতীব সত্য যে, এই স্বরূপকে বুঝিয়া লইতে বিচার শক্তি, অন্তর্মুখতা ও ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার আবশ্যকতা আছে। যাহাহউক, প্রত্যক্ষের পরিহার ও অপ্রত্যক্ষের গ্রহণ, কিছুতেই ন্যায্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না কাজেই বৈজ্ঞানিকের অতীন্দ্রিয়

ইলেক্‌ট্রন দার্শনিকের স্বয়ং প্রকাশ চিন্ময় অগ্নির জ্বলন্ত শিখায় দগ্ধ-কলেবর না হইয়া রহিল না।

জগতের যে স্বরূপটা গুণ ও ক্রিয়ারূপে আমাদের নিকট ধরা দেয়, উহা ছাড়া যদি কোন অপর স্বরূপ অনুসন্ধানে না পড়িত তবে আসল ও নকলের বিবাদ আত্মলাভ করিত না, কিন্তু যখন উহাকে বাদ দিয়াও উহার অধিষ্ঠান বা অপরিহার্য্য আধাররূপে জ্ঞানকে পাওয়া যায় এবং উহা স্বয়ং প্রকাশ স্বভাব, অখণ্ড, নিত্য ও সর্ব্বানুস্যূত, তখন কিপ্রকারে নকল গুণ-ক্রিয়ারূপ স্বরূপকে তাহার আসল স্বরূপ বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে? যদি আসল স্বরূপের অন্বয় ব্যভিচার বা ব্যতিরেক ব্যভিচার কোন নকল স্বরূপে ধরা পড়িত তবে অবশ্যই আসল স্বরূপকে বুঝিবার তরে সুকঠিন পরাবিদ্যার অনুশীলনে সময় ব্যয় করা উন্মত্তের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত না হইয়া থাকিত না। কিন্তু দেখিতেছি বিপরীত; নকল স্বরূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আর আসল স্বরূপ সর্ব্বদাই একরূপ। একখানি বস্ত্রখণ্ডকে কৌশল ক্রমে সময়ে সময়ে নূতন রঙ্গে রঞ্জিত করা যাইতে পারে, কিন্তু উহার অনুভূতিরূপ স্বপ্রকাশ চিন্ময় সাক্ষীকে কিছুতেই রূপান্তরিত করা যাইতে পারে না। এই প্রণালীর পরীক্ষা অপরাপর বিষয়েও উহনীয় রহিল।

জ্ঞান মস্তকে অবস্থিত থাকিয়া বহির্ব্বস্তুর সংবাদ আনিয়া দেয়, ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত এই ধারণার কবলে আসিয়া মানুষ প্রত্যেক বস্তুর প্রাণ-রূপ অখণ্ড প্রকাশ নিত্য জ্ঞানকেও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সে গুণের ইন্দ্রজালে এমন মোহিত হইয়া পড়িয়াছে যে, দেখিয়াও তাহাকে দেখিতে পায় না। যাহাই হউক বিচারশীল ব্যক্তি কখনও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারেন না। তবে অবোধকে প্রবোধ দিবার জন্য তাঁহাকে অনেক কৌশল উদ্ভাবন করিতে হয়।

কেননা একবারে মুখ্য সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া ফেলিলে তাহা অবোধ লোকে ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না এবং তাহার উপরে অসম্ভব বিষয়ের উপদেষ্টৃ অভিযোগ লইয়া আসে। এই জন্যই ব্রহ্ম বিদ্যায় অধ্যবসায় ও অপবাদ ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বহুদিন হইতে এইরূপ উপদেশ পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও যখন অবোধের গতি ফিরিতেছে না, তখন যে নিরঙ্কুশভাবে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানেরই একাধিপত্য জগতে হইবে তাহার আশা কি প্রকারে করা যাইতে পারে আর সকলেই যদি জ্ঞানী হইয়া বসে, তাহা হইলে জ্ঞানের গৌরব যে জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। সুতরাং অবোধের সঙ্গে অবস্থিতি করিয়াও জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানীকে আপন উদ্দিষ্ট বিষয়ে সাবধান ও তৎপর থাকিতে হইবে অবোধের অবৈধ ব্যবহারে বিরক্ত হইলে চলিবে না কেননা লোক সংরক্ষণের সহযোগে ব্রহ্মানুভূতি ও ব্রহ্মচিন্তনই উভয়ের পক্ষে প্রশস্ত বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যদিও এই বৃত্তিতে জীবনমুক্তি-সুখের বিঘ্ন ঘটে, তথাপি লোক হিতকে ভুলিয়া যাওয়া সহৃদয়ের কার্য্য নহে যাহাই হউক, জগতের প্রকৃত স্বরূপ যখন জ্ঞান এবং ইহাই ব্রহ্ম শব্দের প্রবৃত্তি নিমিত্ত, তখন নিঃশঙ্ক চিত্তে বলিতে পারা যায় যে নিখিল জগৎই ব্রহ্ম "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি" প্রভৃতি শ্রুতিও এই ভাবই ব্যক্ত করিয়া থাকে

অজ্ঞানী ও জ্ঞানী জগতের পার্থক্য।

অজ্ঞানীরা এক এক করিয়া পুস্তকালয়ের সকল পুস্তক পড়িয়া ফেলিলেও জগতের অভ্যন্তরে একত্বের নিরাময় প্রশান্ত ছবি দেখিয়া স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হইতে পারেনা। তাহারা সর্ব্বদাই জগতে

নানাত্ব ও বৈষম্য-প্রসূত বিষাদের কোলাহল শুনিতে পায় এমন কি মুনির নিভৃত তপোবনে লইয়া গেলেও তাহারা নানাত্বও ঐ বিষাদের স্বপ্নই দেখিয়া থাকে। আর নানাত্ব দেখিয়া যে সংসারের জঞ্জালেই পড়িয়া থাকিতে হয় তাহা "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" উপনিষদ হইতেও বুঝিতে পারা যায় কাজেই না বলিয়া থাকিতে পারা যায়না যে, নানাত্বের কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত হইয়াও মানুষ কি প্রকারে আপনাকে পরম পদের ভাগী বলিয়া প্রথিত করিতে সাহস পায়? কেহ কেহ আবার প্রতিবৎসরে সন্তানের জন্মদাতা হইয়া ও ভাব ভঙ্গিতে অথবা রচনা কৌশলে আপনাকে জনকের প্রতিনিধি বলিয়া সূচনা করিতে ও ছাড়েন না যদিও এইরূপ লোকের সকল চাতুরী সময়ে ব্যক্ত হইয়া পড়ে, তথাপি অদূরদর্শী সমাজ ইহাদিগকে অলোক সামান্য ভাবের মহাপুরুষ বলিয়াই মনে করে এইরূপ লোকও চক্ষুর অতিথি হইয়া থাকে যে, নেপথ্যে শত শত অনর্থের সৃষ্টি করিয়াও প্রকাশ্যে ঋষি মুনির ভাব ভঙ্গি দেখাইতে কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না যাহাই হউক, এই শ্রেণীর লোক যে, মানসিক অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সংসারে যে কোন অকার্য্য সংঘটিত হইতেছে তাহার মূলে নানাত্বের সাক্ষাৎ বা পরম্পরা রূপে প্রভাব ও সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহা অজ্ঞানীর হৃদয়কে আপন কার্য্য প্রান্তরে পরিণত করিয়া লইয়াছে এইজন্য অজ্ঞানী হইতে যে কোন ব্যাপার অভিব্যক্তি লাভ করে তাহাদ্বারাই ইহা সূচিত হইয়া থাকে যেরূপ ইহার কারুকার্য্য অজ্ঞানীর প্রত্যেক কার্য্যে ব্যক্ত হইয়া পড়ে সেইরূপ ইহাকে বিভিন্ন রূপে বাড়াইয়া তুলাই তাহাদের সমস্ত কার্য্যের উদ্দেশ্য হইতে দেখা যায় যদিও এই বাড়াইয়া তুলাটাকে তাহারা অন্যভাবে বুঝিতেছে ও বুঝাইতেছে, তথাপি বুদ্ধিমান ব্যক্তি উহাতে ভুলিতেছেন

না। তিনি ইহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকে ও ধরিয়া ফেলিয়াছেন কেন না মানুষের এমন কোন্ কার্য্য আছে, যাহা দীর্ঘ দর্শীর প্রজ্ঞা ধরিয়া লইতে না পারে . এমন কি অতি গুপ্তভাবে অনুষ্ঠিত মানব ষড়-যন্ত্রকেও রাজনীতি বিশারদের কুশাগ্রবুদ্ধি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া লয় কাজেই অজ্ঞানী সমাজের কার্য্যাবলির স্বরূপ ও উদ্দেশ্য অনভিজ্ঞের নিকট অব্যক্ত থাকিলেও বিচক্ষণের নিকট উভয়ের অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী

সুচতুর অজ্ঞানী অবশ্যই সুখের কামিজ পরাইয়া তাহার উপরে প্রেমের ঢাকাই চাদর উড়াইয়া জগৎকে লোকের সম্মুখে খাড়া করিতে অধ্যবসায়ের ত্রুটী দেখাইতেছেনা, কিন্তু সুপরিচ্ছদেও যেমন কলের বাবুকে নগরিক ধরিয়া ফেলে, উহার গতি ও সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছে দূরদর্শী উহাকে ঐরূপ বেশে দেখিয়া ও উহার মায়িক ভাগকে অসার বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন না করিবেন কেন? মায়িক ভাগ যেরূপ অনির্ব্বচনীয়, ব্রহ্মসত্তা হইতে সেইরূপ স্বতন্ত্র সত্তা-শূন্য পরন্তু এইরূপে খাড়া করাতে অজ্ঞানী সমাজ ইহাকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া, এমন ভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, কিছুতেই ইহার লাবণ্যময়ী মায়িক মূর্ত্তি ছাড়িয়া প্রকৃত স্বরূপের দিকে যাইতে পারিতেছেনা যদিও সময় সময় ইহার বিষময় ফল ভোগ করিতেছে, তথাপি জগৎই সুখের নিদান, এই ভ্রান্ত ধারণা তাহাদিগের মনে এরূপ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে যে কিছুতেই উহা ত্যাগ করিতে পারে না। বরঞ্চ উহার পোষকতায় তাহাদের শ্রীমুখ হইতে ইহাই নিঃসৃত হয় যে, "বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর" . যাহাই হউক মায়িক জগৎই যে অজ্ঞানীর উপজীব্য হইয়া পড়িয়াছে তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় লক্ষ্মীর বড় পুত্র হইবার জন্য যে সকল অসামান্য সাধন পদ্ধতি তাহারা নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছে, ঐ গুলি

হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা অবিদ্যা দেবীর বড়ই প্রিয় পাত্র কেন না এই দেবীর অনুগ্রহ ভাজন হইতে না পারিলে, মানুষ কখনও ঐ প্রকার অপরূপ সাধন পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারে না আর তাহাদিগের মহিমায়ই যে, দীন দুঃখী লোকেরা পরিশ্রম দ্বারা সংসারের হিতসাধন করিতেছে, তাহা ও অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না যদি ও তাহারা অন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা যোগ্য ভাবে আপনাকে অথবা পরিবার বর্গকে পোষণ করিতে পারিছে না, তথাপি তাহাদের পরিশ্রমে যে, এক শ্রেণীর লোক ধনবান হইতেছে, সম্ভ্রান্ত লোকের পক্ষে ইহা কম সুখের বিষয় নহে

অজ্ঞানী জগতের কার্য্যে যেরূপ নানাত্বের কোননা কোন সংশ্রব থাকে সেইরূপ উহা ব্যক্তিগত ভাব মূলকও দেখিতে পাওয়া যায় যদিও তাহারা উহার উপরে সাধারণ ভাবের রঙ লাগাইতে ছাড়েনা, তথাপি উহার স্বাভাবিক দুর্গন্ধ কিছুতেই নিবারিত না হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এই বিষয়টা সুস্পষ্টরূপে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে গেলে অবশ্যই বর্ত্তমান রাজনীতি ও অর্থনীতির সহিত পরিচয় আবশ্যক কিন্তু জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর পক্ষে অনাত্ম সম্পর্কিত বিষয়ে সাধারণ ভাবে পরিজ্ঞান লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। পক্ষান্তরে যে কোন ব্যক্তিকে সাধারণের হিতার্থ নিযুক্ত বলিয়া মনে হয়; দেখা যায়, তিনিও ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকেই প্রধান লক্ষ্য করিয়া বসিয়া আছেন কাজেই নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হওয়াতে সাধারণ হিত তাহার পক্ষে উপলক্ষ্য মাত্র; অর্থাৎ সাধারণ হিতকে তিনি নিজের লক্ষ্য সিদ্ধির সাধন বলিয়াই জানেন তবে কথায়ও লিখায় তিনি যে সাধারণের প্রতিনিধি ইহাই ব্যক্ত হইয়া থাকে যাহাই হউক, অজ্ঞানীজগতে যে ব্যক্তিগত ভাবের প্রাধান্য তাহা অস্বীকার করা যায় না আর আপন চিন্ময় আত্মাকে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা বলিয়া

জানিতে না পারিলে যে ব্যক্তিগত ভাবের দায় এড়াইতে পারা যায় ■ সম্বন্ধে সন্তোষজনক দৃষ্টান্ত ও পাওয়া যায় না।

অন্তঃকরণ শুদ্ধির দিক দিয়া দেখিলে ও অজ্ঞানী সম্প্রদায়ে এইরূপ লোক কমই চক্ষুর অতিথি হয় যে হৃদয়ের কাম প্রভৃতি শত্রু যোগ্য ভাবে দমন করিযা উঠিতে পারিয়াছে তবে কোন কোন স্থলে এই গুলিকে নিস্তেজ ভাবে থাকিয়া সময়ান্তরে জাগিয়া উঠিতে দেখা যায়। যদিও এই প্রকারে জাগিয়া উঠাকে অনেকে বুঝিয়া লইতে পারেনা, তথাপি প্রকারান্তরে ব্যক্ত হইয়া পড়ে দেখিতে পাই অনেকে আবার এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন যে, এইগুলি জাগিয়া না উঠিলে সংসারের কোন কার্য্যই পূর্ণাঙ্গে সম্পন্ন হইতে পাবে না প্রকৃত পক্ষে এই ধারণাটাকে একবারে খাম খেয়ালী বলিয়া মনে করা যায় না ; কেননা স্মরণাতীত কাল হইতে এইরূপ ব্যবস্থা মানব সমাজে বিধিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে যাহাতে এই গুলির সম্বন্ধ আব শ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তবে এই গুলিকে বিবেকের বশবর্ত্তী করিয়া চলিলে তত অনর্থ পাতের সম্ভাবনা থাকেনা। পরন্তু ব্রহ্মাত্মার সাক্ষাৎ-কার না হইলে কে যে ইহাদিগকে বিবেকের বশবর্ত্তী করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা অনির্দ্দিষ্টই থাকিয়া যাইতেছে। তাহার কারণ এই যে, মায়িক বস্তুকে অনিত্য বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় করিতে না পারিলে বিবেকেরই আত্মলাভ হয় না এই জন্যই বর্ত্তমান সভ্য সমাজ, সংসারে শান্তি স্থাপনের জন্য যে উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, তাহাই অফলোপধায়ক হইযা দাঁড়াইতেছে এমন কি এক দিকে সুশৃঙ্খলার শীতল সমীরণ প্রবাহিত করিতে গেলেই অপরদিকে বিশৃঙ্খ-লার প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত স্বতঃই বহিতে থাকে এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া কে মনে করিতে পারে যে, সংসারের অশান্তি উঠিয়া যাইবে ? তবে বড় লোক দিগের পক্ষে যে সকলই শ্লাঘার বিষয় হইয়া থাকে এককথা স্বতন্ত্র।

সভ্য সমাজ যতই চেষ্টা করুক না কেন, মায়িক বস্তুকে অসত্য বলিয়া অবধারণ না করিলে, কিছুতেই বিবেক আসিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিবেনা। এবং বিবেক আলিঙ্গন না করিলে অন্তঃশক্রর ষড়যন্ত্রে পড়িয়া স্মৃতিবিভ্রম বুদ্ধি বিনাশ, ও আত্মাপলাপ হইতে অব্যাহতি পাইবেন কিনা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে যাহাই হউক, অন্তঃশক্রকে স্ববশে আনিতে না পারিলে মানুষ কোন ক্রমেই অসদনুষ্ঠান হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেনা পূর্ব্বের মুনি ঋষিরা এইজন্য প্রথমে এই অরাতিকে আপনার বশবর্ত্তী করিবার জন্য তপস্যায় নিযুক্ত হইতেন যখন বুঝিতেন যে ইহা আপন বশে আসিয়াছে, তখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের সাধন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে নিরত হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জনিত লোকোত্তর শান্তি ভোগের অধিকার লাভ করিতেন

লৌকিক বিষয়ে বর্ত্তমান সভ্যতা হইতে অবশ্যই অনেক শিখিতে হইবে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত আর্য সভ্যতাই প্রশস্ততর পথ কেননা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে পরম শান্তি লাভ করাই ঋষি জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আর এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হইলে মানুষ কিছুতেই পশুভাবের দমন ও দেবভাবের সংবর্দ্ধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। একমাত্র বুদ্ধি শক্তিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া চলিলে কোথায়ও না কোথায়ও পশুভাবের গুপ্তগর্ত্তে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইতেই হইবে আর ধর্ম্ম ব্যতিরেকে কেবল বুদ্ধিশক্তি যে মানুষকে পশু হইতে বিভক্ত করিতে পারেনা তাহা বানর ও গৃহ পালিত সারমেয় প্রভৃতির বুদ্ধি সম্পর্কিত ব্যাপার দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় সুতরাং ইহা অবিসংবাদী সত্য যে, কেবল ধর্ম্মই মধ্যস্থলে থাকিয়া মনুষ্য ও পশুর শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিতেছে যদিও মানববুদ্ধি সমধিক উন্নত, তথাপি কোন কোন বিষয়ে পশুবুদ্ধিকে ও মানববুদ্ধির প্রতি

যোগিতা করিতে দেখা যায়। যাহা হউক পশুভাবের দমন করিতে না পারিলে যে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারেনা তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই পক্ষান্তরে 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ" নীতির অনুগামী মানবও যে সম্মান লাভ করে, তাহাও পশুভাবের প্রেরণা জনিত। কেননা এইরূপ মনুষ্যের প্রতি যে প্রকৃত শ্রদ্ধা হয় তাহা নহে; ভয়ে বা স্বার্থ সাধন উদ্দেশ্যে কৃত্রিম সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে মাত্র কেননা যাহারা উক্তরূপ সম্মান দেখায়, সময়ান্তরে তাহারাই আবার প্রভুর কুৎসা রটনার অগ্রণী হইয়া থাকে তবে ইহাও সত্য যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তিও সম্পূর্ণরূপে পাশবিক ভাবের দায় এড়াইতে পারেন না অর্থাৎ অধার্ম্মিক যেমন উহাতে ডুবিয়া যায়, আর উঠিতে পারেনা, এমন কি উঠিতে চেষ্টা করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্তও হারাইয়া ফেলে; ধার্ম্মিকের পক্ষে তাহা হয়না, তিনি অনুতাপের তীব্র কশাঘাতে মনকে সংযত করিয়া থাকেন।

নানাত্ব যখন অজ্ঞান হইতেই আত্মলাভ করিয়াছে, কারণ ব্রহ্ম এক, নির্ব্বিকার ও অখণ্ড স্বরূপ হওয়াতে তাঁহা হইতে উহার আবির্ভাব অসম্ভব; তখন অজ্ঞানীরা উহাতে বিমোহিত না হইবে কেন? আর জগৎ হইতে ইহার তিরোভাব হইলে তাহার কোন মূল্যই থাকে না। কবি বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি সকলেই উপকরণের অভাবে মনের আগুন মনেই নির্ব্বাপিত করিতে থাকিবে ইহাতে প্রেমিক ও ভক্তের পক্ষে এক মহান অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, কেননা বিভিন্নতাই প্রেম ও ভক্তির মূল অবলম্বন। তবে অহৈতুকী ভক্তি ও অভেদ প্রেমের কথা স্বতন্ত্র এইস্থলে ইহাও বিবেচ্য যে, বিভিন্নতা জগৎ হইতে উঠিতে পারে কিনা? কেননা একই সময়ে যে সকলের সুষুপ্তি হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব আর জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় বিভিন্নতার প্রতাপ অদম্য ও অপ্রশমনীয়।

কাজেই অজ্ঞানী সমাজ যে নানাত্বকেই জাগতিক ব্যাপারের মূলে দেখিতে পাইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? পক্ষান্তরে বিভিন্নতা বা নানাত্ব যখন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তখন তাহাকে মনে মনে উঠাইয়া দিয়া অনির্দ্দিষ্ট একত্বের উপলব্ধির আশায় পরিশ্রান্ত হইতে যাওয়া কি প্রকারে সুবিবেচনার কার্য্য হইতে পারে?

এই কথাগুলি যে, লৌকিক নীতির হিসাবে সত্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বেদনীতি বা বিবেক মূলানীতি স্পষ্টরূপে ইহাই বুঝাইয়া দেয় যে, প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বস্তুও অনেক সময়ে অসত্য হইয়া দাঁড়ায় বিশেষতঃ ভূতভ্রান্তি ও আকাশের নীলিমা ভ্রান্তি স্থলে ইহার অসত্যতা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়. কাজেই যখন ভ্রান্তি ও প্রত্যক্ষের বেশে ধরা দেয়, তখন নানাত্ব ও বিভিন্নতাকে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ দেখিয়াই সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না আর অসত্য মূলক ব্যাপার যদি আপাততঃ সুখ ও তৃপ্তি লইয়া আসে তথাপি তাহাতে লিপ্ত হওয়া বিচারশীলতার পরিচায়ক হইতে পারেনা অবশ্যই নানাত্বকে অপরাবিদ্যার ভিত্তি বলিলেও অন্যায় হইবেনা, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে তাহা নহে কেননা সত্যতার লক্ষণ, কার্য্যকারিতা ও হিতজনকত্ব না বলিয়া স্থায়ীভাব বা অপরিবর্ত্তনীয়তাই বলা উচিত। যাহা একভাবে থাকে, কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না তাহা সত্য, আর যাহাতে এই উভয় লক্ষণের সামঞ্জস্য হয় না, তাহাই অসত্য বা মিথ্যা; কাজেই অপরা-বিদ্যার প্রীতিকর ও মনোমাদক উপদেশ শুনিয়া পরম শান্তি আনয়ন কারিণী পরাবিদ্যার সহিত বিরোধ উপস্থিত করা সঙ্গত নহে আর জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায়, নানাত্ব প্রতীতিগোচর হইলেও উহাকে সত্য বলিয়া বিবেক ধরিয়া লইতে পারেনা যদিও অন্ধ পরম্পরাতে অবিবেকী লোকেরা জগৎকে সত্য বলিয়াই বুঝে, তথাপি বিবেকি-

সমাজ ইহাকে মিথ্যা বলিয়াই অবধারণ করিয়া থাকেন। সুতরাং জগৎ প্রতীয়মান হইলেও উহাকে সত্য মনে করিয়া প্রকৃত ধ্রুব সত্যের গবেষণায় তটস্থ হওয়া মূর্খতারই কার্য্য

অজ্ঞানীর সঙ্গে তুলনা করিলে যেরূপ জ্ঞানী কোটি অজ্ঞানীর মধ্যে একজন দাঁড়ায়, সেইরূপ কোন জ্ঞানী জাগতিক মহান্ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন কিনা এইরূপ দ্বিকোটিক জ্ঞান আত্মলাভ না করিয়া ছাড়েনা। কেননা যাঁহারা এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও জ্ঞানী বলিয়া নির্ব্বাচিত হইতে দেখা যায় না। কাজেই জগতের হিতকর কার্য্যে উদাসীন মুষ্টিমেয় জ্ঞানীর কথায় প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে অনিশ্চিত সুখ শান্তির প্রত্যাশায় অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলা কখনও বিচারশীলের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না আর ইহাও সম্ভব যে, বুদ্ধির অগম্য জিনিষের চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া থাকিবে। ইহার যে উদাহরণ দিতে পারা যায় না তাহাও নহে কেনন পাগল জ্ঞানীও দেখিতে পাওয়া যায়। এবং শাস্ত্রেও জ্ঞানীর উন্মত্তবৃত্তি বর্ণিত হইয়াছে দৃষ্ট হয়। যদিও সকল জ্ঞানীই পাগল নহে তথাপি যিনি রচনা বা কথার ভঙ্গীতে আপনাকে জ্ঞানী প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হন তিনি যে প্রকৃতিস্থ আছেন এ বিষয়ের কোন প্রমাণ নাই পক্ষান্তরে বাচনিকজ্ঞানী ও পুথি লিখিতে এবং অভিভাষণ দিতে অভ্যস্ত তাহারও নিদর্শন অভাবগ্রস্ত নহে

অবশ্যই এইরূপ উক্তিকে প্রলাপোক্তি বলিতে পারা যায় না; কিন্তু ইহা যে বক্তার বিচার বৈপরীত্যের সূচনা করে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই কেননা জ্ঞানীরা মায়িক ব্যাপার লইয়া ব্যতিব্যস্ত না হইলেও জগতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অভিব্যক্তি, শিক্ষা ও ব্যাপ্তি সংবর্দ্ধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আর জগতে যে এই সম্বন্ধে সময় সময়

৪—

করার কোন আবশ্যকতা নাই তাহাও নহে এই জন্য যে,—মানব সমাজ হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তাহার অধিকার উঠিয়া গেলে, ঐ সমাজ ক্রমনীতিতে যাইয়া পশুভাবের পঙ্কিল গহ্বরে ডুবিয়া পড়িবে কাজেই মায়িক জগতের নীতির দিক দিয়া দেখিলেও ইহা সাব্যস্ত হয় যে, সংসারে যেরূপ জড়বিজ্ঞান ও রাজনীতি প্রভৃতির আবশ্যকতা আছে, সেইরূপ ঔপনিষদী-বিদ্যা ও অন্যথা সিদ্ধ নহে; কেননা অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের উন্নতির সমীকরণেই মানব সমাজের পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে আর অপরাবিদ্যা বহির্জগৎকে অলকাপুরীতে পরিণত করিতে পারিলেও অন্তর্জগৎ শান্তির রাজমহল প্রস্তুত করিতে সর্ব্বথা অসমর্থ পক্ষান্তরে যখন 'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ' শ্রীভগবানের উক্তি হইতে পরাবিদ্যা সেবনের প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হইতেছে তখন ঐ বিদ্যার শরণে গেলে যে মানুষ ঐহিক ফলে বঞ্চিত থাকে এই অপরূপ কল্পনার গরিমা লইয়া কিপ্রকারে চলিতে পারা যায়? এইরূপে পরাবিদ্যার বিষয় অদ্বৈত-ব্রহ্ম বুদ্ধির অগম্য হইয়াও স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানরূপ হওয়াতে নিরন্তর প্রত্যক্ষরূপেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন কাজেই এহরূপ ব্রহ্মের পরিজ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন তিনি বহির্বিষয়ে অনবধান হইলেও বিজ্ঞ সমাজে কিপ্রকারে পাগল বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারেন? তবে যে শাস্ত্রে জ্ঞানীর পক্ষে উন্মত্ত বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার তাৎপর্য্য বিষয়াসক্তি বর্জ্জন ও জীবন্মুক্তি সুখের অর্জ্জন ব্যতীত অপর কিছু নহে

নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সাব্যস্ত হয় যে অজ্ঞানী জগতের মূলমন্ত্র স্বার্থ যদিও এই জগতের কোন কোন অনুষ্ঠান পরার্থতার আবরণে দেখিতে পাওয়া যায় বটে তথাপি উহার মূলে প্রচ্ছন্নভাবে স্বার্থই বর্ত্তমান থাকে তবে ইহা সত্য যে স্থল বিশেষে স্বার্থটা এক ব্যক্তিক না হইয়া বহুব্যক্তিক হইতে পারে

পরন্তু বহুব্যক্তিক স্বার্থ অপরের পক্ষে যেরূপ অনর্থ লইয়া আসে এক-ব্যক্তিক-স্বার্থ সেরূপ নহে যাহাই হউক স্বার্থ মাত্রই মহানুভবতার বিরোধী, কারণ ইহার আবির্ভাবে মনুষ্যের উদারভাব সঙ্কোচিত হইয়া পড়ে। আর বহুব্যক্তিক স্বার্থের মূলে যে এক ব্যক্তিক-স্বার্থ থাকে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বার্থ জিনিষটাকে একবারে ধুইয়া ফেলিলে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে কিনা ইহ অমীমাংসিতই থাকিয়া যাইতেছে না যাইবে কেন, যেখানে নিস্বার্থ কার্য্যের দোহাই শুনিতে পাই বিশেষ ভাবে দেখিলে, সেই খানেই স্বার্থপরতা ধরা পড়িয়া যায় ধার্ম্মিক সমাজে যেরূপ ধর্ম্মের ভান চলে, সভ্য সমাজে নিস্বার্থ অনুষ্ঠানের প্রতারণাও তদ্রূপই চলিতেছে এবং রাম শ্যামের ন্যায় ব্যক্তিও যে নিস্বার্থতার বাহানা ধরিয়া গণ্যমান্য হইতেছে, ইহাও দৃষ্ট হয় যাহা হউক, ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, অজ্ঞানী জগতে স্বার্থ অপেক্ষা নিস্বার্থতার অধিক সমাদর নহে

অজ্ঞানীজগতের অস্তিত্ব উদ্দেশ্য, সংসারকে ভোগোপকরণের প্রাচুর্য্য, স্বচ্ছলতা ও সমীকরণের দ্বারা ক্রমনীতিতে সুখের নন্দন উপবন করিয়া তুলা যদি ও এই উদ্দেশ্যকে অবিগীত ও শ্লাঘনীয় না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না, তথাপি ইহাকে সম্ভাবনীয় বলিয়া ধারণা করিয়া উঠা সহজ ব্যাপার নহে কেননা নূতন নূতন ভোগোপকরণের আবির্ভাবে মুষ্টিমেয় লোকের মস্তকে সুখের কুসুমবর্ষণ হইলে ও অপ-রাপর লোকের মস্তকে দুঃখের শিলাপাত হইতেই দেখা যায় আবার ভোগোপকরণ সংগ্রহের নিদানগুলিও যে কতিপয় ব্যক্তি আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছেন তাহাই বা কি প্রকারে অস্বীকার করিতে পারা যায়। যখন মহদুদ্দেশ্যানুবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তৎসাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতার যোগ্যতা এবং ফলোপধায়িকা শক্তি দেখা উচিত, তখন প্রচলিত নীতির আপাত-সুন্দর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ভুলিয়া যাওয়া কখনই পরিণাম-

দর্শিতার লক্ষণ নহে স্থতরাং পৃথিবীর সকল লোকেই সমভাবে ভোগ্য বস্তুর উপভোগ জনিত সুখভোগ করুক এইরূপ ভাব মহান বা উদার হইলে ও ইহার আনুরূপ্যে কার্য্যানুষ্ঠান কমই দেখিতে পাওয়া যায় আর লক্ষীর বড় পুত্র ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণী যে এই ভাবকে হৃদয়ে স্থান দিবেন তাহার ও কোন প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না যাহাই হউক অজ্ঞানী সমাজের এই ভাবটা যে অনুকরণীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কেননা "আত্মোপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন সুখং বা যদিবা দুঃখং সযোগী পরমো মতঃ " ভগবদ্বাক্যে রহিয়াছে।

বর্ত্তমান অজ্ঞানী জগৎকে অতীত অজ্ঞানী জগৎ অপেক্ষা উন্নত বলিয়া মানিয়া লইলে ও বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে ইহার উন্নতি আজ পর্য্যন্ত বহির্মুখীই রহিয়াছে কেননা অন্তর্মুখতার প্রধান লক্ষণ যে পার্থিব বস্তুকে অসত্য বলিয়া জানা তাহারই অভাব দেখিতে পাওয় যায় কৃতবিদ্য ও কতিপয় বীতরাগ লোককে বাদ দিয়া শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অজ্ঞ, অভিজ্ঞ সকলেই এই সম্বন্ধে সত্যত্ব পরিজ্ঞানকে অব শ্যম্ভাবী জিনিযে পরিণত করিয়া বসিয়াছে এমন কি যদি কেহ খোলা কথায় এই বিষয়কে অসত্য বলিতে চায়, তবে সে উন্মত্ত বলিয়াই তাহাদের নিকট পরিগণিত হইয়া পড়ে কাজেই আধ্যাত্মিক বিষয়ে লোকের অরুচি দিন দিন বাড়িয়াই উঠিতেছে এই অরুচির পরি ণাম লইয়া বিবেচনা করিতে গেলে দূরদর্শীর মনঃপ্রাণের নৈরাশ্য ও বিষাদের অন্ধকারে ছাইয়া ফেলে তবে ইহা সত্য যে আপাতদর্শীর দল, নিজের অসামান্য কল্পনার বলে ইহার ভবিষ্যৎকে উন্নতির অন্তিম সীমায়ই তুলিয়া লন লউন, কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ভাবিতে শিক্ষা করা ও তাঁহাদের পক্ষে উচিত আর যখন এই অরুচির বর্ত্তমান অবস্থা অমানুষিক ভাবের প্রসৃতি জ্ঞাপন করিয়া দিতেছে, তখন ইহার ভবিষ্যৎ যে দেব ভাব লইয়া আসিবে, বিজ্ঞব্যক্তি তাহাতেই বা

কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন? যাহাই হউক, পার্থিব বস্তুর আসক্তি যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে ভবিষ্যতে যদি এইরূপই বাড়িতে থাকে, তবে যে লোকের কি অবস্থা হইবে তাহা ভাবিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয় তথাপি এই আসক্তির পরমায়ু যে বেশি দিন নহে তাহার পূর্ব্ব সূচনা স্থানে স্থানে আত্মলাভ করিতেছে কারণ, প্রায় সমস্ত দেশের বিজ্ঞসমাজই প্রচলিত নীতিতে অসন্তোষ হইয়া পড়িতেছেন একমাত্র ইহাই নহে, জ্ঞানানুশীলনেও নিযুক্ত হইতে দেখা যাইতেছে। বিশেষতঃ সভ্য সমাজের বর্ত্তমান ব্যাপারটাও বুঝাইয়া দিতেছে যে, অবিলম্বেই লোকের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে; এবং অদূর ভবিষ্যতেই মানুষ বুঝিতে পারিবে যে, দেবভাবের শরণে না আসিলে কিছুতেই পৃথিবীতে সুখ শান্তির যথাযথরূপে প্রসার বা আবির্ভাব হইবার নহে কেননা যেখানে দেবভাবের আবির্ভাব দেখা যায়, সেইখানেই সুখ, সেইখানেই শান্তি যদিও কম লোকের মধ্যেই উহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি ইহা সময়ে অপরাপর লোকের হৃদয়ে যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই

জ্ঞানী-জগতে অজ্ঞানীর ন্যায় অসুখ অশান্তি ও স্বার্থের একাধিপত্য কমই দেখিতে পাওয়া যায় অবশ্যই জ্ঞানীসমাজ মায়িক বিষয় লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে বা সময় ব্যয় করিতে চাহেন না কিন্তু জগতের প্রকৃত হিতেচ্ছাকেও হৃদয় হইতে বিদায় দিতে প্রস্তুত নহেন্। যদিও এই হিতকে অজ্ঞানী সমাজের অভিমত হিতের সহিত মিলিতে দেখা যায় না, তথাপি পরীক্ষায় ইহাই নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হয় আর হিত ও অহিতকে বুঝিয়া উঠাও সহজ ব্যাপার নহে কেননা অনেক স্থলে হিতকে অহিতের এবং অহিতকে হিতের আবরণে ঢাকা দেখিতে পাওয়া যায় কাজেই উভয়ের পরীক্ষককে অতিশয় সতর্কতার সহিত এই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হয় যাহাই হউক, অজ্ঞানী জগতের

তুলনায় জ্ঞানী জগতের পরিমাণ অনেক কম হইলেও অজ্ঞানীকে জ্ঞানীর আদর্শেই চলিতে হইবে এই জন্য যে, প্রকৃত সুখ শান্তির উপকরণ সমূহ জ্ঞানীদিগের অধিকারেই অস্মর্য্যমান কাল হইতে রহিয়া আসিতেছে যদিও জ্ঞানী হইতে এই সকল উপকরণ সংগ্রহ করা অজ্ঞানীর পক্ষে অতীব কঠিন, তথাপি শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং" নীতিতে তাহাদিগকে ইহা করিতেই হইবে অবশ্যই অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যখন জ্ঞানীও অজ্ঞানীর ন্যায় অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার মস্তিষ্কও অজ্ঞানীর মস্তিষ্কের আনুরূপ্যেই গঠিত, তখন জ্ঞানী হইতেই বা সুখ শান্তির উপকরণ সংগ্রহের প্রত্যাশা কিরূপে করা যাইতে পারে ? কিন্তু জ্ঞানীর প্রজ্ঞা সম্পর্কিত নির্ম্মলতা এবং ব্যবহারের নির্লিপ্ততা বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেই এইরূপ মনে করার পরীক্ষা হইয়া যায় বুদ্ধিশক্তি ও বিবেকের কার্য্য আপাততঃ উভয়ের একপ্রকার দেখিতে পাইলেও উহাদের বিশুদ্ধতা, উদ্দেশ্য-প্রণোদন, ও বিষয়ানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে বৈষম্যই বিচারে ধরা পড়িয়া যায় সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতে গেলে, জ্ঞানীর বুদ্ধি ও বিবেক বিশুদ্ধ, মহদুদ্দেশ্য প্রণোদনকারী এবং অবিগীত বিষয়ানুবর্ত্তী আর অজ্ঞানীর উভয়ই অবিশুদ্ধ অসদুদ্দেশ্য আনয়নকারী ও বিগীত বিষয়ের অনুবর্ত্তী তবে ইহা সত্য যে এই বৈষম্য বুঝিয়া লইতে অন্ততঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুতার আবশ্যকতা আছে অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানী ও জিজ্ঞাসু উভয়েই বৈষম্য সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন। যদিও কোন কোন সাংসারিক ব্যাপারে অজ্ঞানীর বুদ্ধির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক বিষয়ে অথবা আধ্যাত্মিক মিশ্রিত অনাধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞানীর বুদ্ধিই প্রকৃত তথ্যের আবিষ্কার করিয়া দেয়।

তৃণকুটিরের তৃণাসনে বসিয়া জ্ঞানী যে সূক্ষ্ম তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, হিরকখচিত প্রাসাদের বহুমূল্য আসনে উপবিষ্ট

হইয়াও অজ্ঞানী তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে খবর পর্য্যন্তও জানিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানীর সহিত তুলনা করিতে গেলে অজ্ঞানীর গৌরব অক্ষত শরীরে থাকিতে পারে না তবে বাক্‌চাতুর্য্য ও লিপিচাতুর্য্যে অজ্ঞানী যে জ্ঞানী হইতে সমুন্নত তাহা জ্ঞানীও স্বীকার করিয়া থাকেন কেননা অনাত্মচর্চ্চা জ্ঞানীর পক্ষে অবৈধ বলিয়াই পরিগণিত হইয়া আসিতেছে পক্ষান্তরে নিষ্ঠাবান জ্ঞানী উহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মৌনব্রত অবলম্বনেও বাধ্য হইয়া থাকেন। তিনি মনে করেন যে নিরন্তর ব্রহ্মাকার বৃত্তি সুরক্ষিত রাখা অপেক্ষা জ্ঞানীর পক্ষে অপর কোন কার্য্যই প্রার্থনীয় হইতে পারে না যাহা হউক, যিনি ইহাতে অসমর্থ, তাহার পক্ষে ব্রহ্মবিষয়িনী চর্চ্চা কখনও অবজ্ঞ জিনিষে পরিণত হইতে পারে না এই [illegible] যে, ইহা তাঁহাকে মায়িক বিষয়ে লিপ্ত হইতে দেয় না, এবং ইহা হইতে অজ্ঞানী ও জিজ্ঞাসু সমাজের অসামান্য উপকার হইয়া থাকে

অনুষ্ঠাতা অনুষ্ঠেয় বিষয়ে আসক্ত হইলে অবশ্যই অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গতা ও সমীচীনতা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহা সাক্ষাৎ বা পরম্পরারূপে বিরোধী অনুষ্ঠানের আত্মলাভ সম্বন্ধে পূর্ব্ব সূচনা না করিয়া থাকিতে পারে না কেনন আসক্তি মূলক অনুষ্ঠান মাত্রই বিলম্বে বা অবিলম্বে নিবর্ত্তক অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা লইয়া আসে না আসিবে কেন? আসক্তি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র বিবেক স্বতঃই সঙ্কোচিত হইয়া পড়ে এইজন্য অনুষ্ঠান উদ্দিষ্ট-ফলের সঙ্গে বিপরীত ফলও প্রসব করিয়া ফেলে অথবা আশানীয় ফলের বৈপরীত্যে অপরূপ ফল আনিয়া দেয় আর এইরূপ অবস্থাতে আসক্তি যে মানুষের বিষাদ, বিরক্তি ও নিরুৎসাহ লইয়া আসে তাহার যথেষ্ট উদাহরণও পাওয়া যায় কাযেই আসক্তি মূলক কার্য্যের একদিক দেখিয়া বিমোহিত হইলে চলিবেনা যদিও আসক্ত মূলক অনুষ্ঠান

বর্ত্তমান পৃথিবীর কতকগুলি লোককে সমৃদ্ধি সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি তাহারা যে এমনীতিতে মানুষিক ভাবে বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না অপিচ এরূপ সমৃদ্ধি যে কোটি কোটি লোকের দীনতার কারণ তাহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যাহা হউক, আসক্তি যে চিত্তপ্রসাদের অন্তরায় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই আর আসক্তি অজ্ঞান অবস্থার সূচনা করিয়া দেয় এইজন্য তন্মূলক কার্য্যগুলি অজ্ঞানী হইতেই যে আত্মলাভ করে ইহাও বেশ বুঝা গেল কাযেই জ্ঞানী যে এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানের গৌরব সঙ্কোচ করিবেন ইহাতে স্বতঃই মনে সন্দেহের উদয় হইয়া থাকে

জ্ঞানীদিগের সংখ্যা অজ্ঞানী অপেক্ষা অতি অল্প হইলেও তাঁহাদের কার্য্যাবলীতে আসক্তির একাধিপত্য নাই তাঁহারা কার্য্যের অসিদ্ধিতে বা অভাবনীয় পরিণামে অজ্ঞানীর ন্যায় ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলেন না বরঞ্চ পূর্ব্বের ন্যায় ধীরভাবে সিদ্ধি ও সুপরিণামের নব উপায় উদ্ভাবনে অটল অধ্যবসায় দেখাইয়া থাকেন আগন্তুক বিপৎপাতেও জ্ঞানীকে অজ্ঞানীর মত বিপন্ন হইতে দেখা যায় না এমন কি আত্মীয় বা সুহৃদের মৃত্যুতে ও শোকে অধীর হইয়া পড়েন না মোটের উপর ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইষ্ট বা অনিষ্ট কোন ব্যাপারেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি বিচলিত হয় না অজ্ঞানী সমাজে যদিও এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জ্ঞানী সমাজেই ইহার বাহুল্য দৃষ্ট হয় ইহার প্রকৃত কারণ এই যে জ্ঞানী কখনও পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণাকে হৃদয়ে স্থান দেন না বা না দিবার জন্যই চেষ্টা করেন পক্ষান্তরে অজ্ঞানী উহা হইতে ভীত হইয়া সুদূরে অবস্থিতি করে আর অজ্ঞানীর কোন কার্য্যই যে এই বাসনা ত্রিতয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী না হইলে সম্পন্ন হইতে পারে না তাহারও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় এইরূপে জ্ঞানীর অনাসক্তিমূলক কার্য্য সম্বন্ধে ইহ

উহনীয় রহিল যে জ্ঞানী যেরূপ কার্য্যকে মায়িক জানেন সেইরূপ তাঁহার সাধন, বিষয়, উদ্দেশ্য এবং পরিণামও তাঁহার পক্ষে অসত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে আর মায়িক বা অসত্য বস্তুতে আসক্ত হওয়া যে বিচার বৈকল্যেরই পরিচায়ক তাহাতেই বা কি সন্দেহ আছে? কাজেই জ্ঞানের মূলে নিত্যানিত্য বস্তুর দৃঢ় বিচার রহিয়াছে এইজন্য জ্ঞানীর উপর অসত্য বস্তুর আসক্তি অভিযোগ আনিতে পারা যায় না।

কি বহির্ব্বিষয়ক কি অন্তর্ব্বিষয়ক সকল কার্য্যেই লোক সংরক্ষণ জ্ঞানীর প্রধান উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় এমন কি শারীরিক ব্যাপারেও তাঁহার ঐ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়া থাকে তবে জ্ঞানী বন্ধু দিগের কথা স্বতন্ত্র এই উদ্দেশ্য আছে বলিয়াই জ্ঞানীর কার্য্য হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা কম থাকে যদিও সাধন বিভ্রাট বা ইতিকর্ত্তব্যতা-বিভ্রাট জ্ঞানীদিগেরও হইয়া থাকে, তথাপি উদ্দেশ্য-বিভ্রাটের আগুনে কখনও তাঁহাদিগকে জ্বলিতে দেখা যায় না। তাঁহাদের কার্য্য-প্রাঙ্গণে এই অগ্নির ধূম উদগীর্ণ হয় না। আর ইহাও অসত্য নহে যে, উদ্দেশ্য বৈপরীত্য যেরূপ অনর্থ লইয়া আসে, সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতার বিভ্রাট সেরূপ নহে এই জন্যই কর্ম্ম কুশল লোক অসদুদ্দেশ্য প্রবর্ত্তিত সৎকার্য্যেরও অবজ্ঞাই করিয়া থাকেন না করিবেন কেন? যাহার উদ্দেশ্য নিরবদ্য হইতে পারে নাই, সেই কার্য্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কুফল উৎপন্ন না করিলেও পরম্পরাতে উহারই জন্মদাতা হইয়া পড়ে জ্ঞানীর কার্য্য পদ্ধতির মূলে ঐ উদ্দেশ্য নিগূঢ় রহিয়াছে বলিয়াই জনক প্রভৃতি রাজন্য কেশরীদিগের অবিগীত শিষ্টাচারানুযায়ী শাসনের কথা আমরা শুনিতে পাই তাঁহাদের অসামান্য অনুষ্ঠান যদি প্রকৃত পুঞ্জের সংরক্ষণ মূলক না হইত, তবে তাঁহাদিগকে আসুরী-সম্পদের লোক ব্যতীত কখনও দৈবী-সম্পদের লোক বলা যাইতে পারিত না।

জ্ঞান লাভ হইবা মাত্র জ্ঞানী আপন আত্মাকে নিখিল প্রাণীর আত্ম বলিয়া মনে করেন ; এই জন্যই তাঁহাদের আপন স্বার্থ নিখিল ব্যক্তির স্বার্থে পরিণত হইয়া পড়ে আর যাঁহারা সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমাণ শরীরের অভিমানী ব্যক্তি বিশেষকে আত্মা বলিয়া জানেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞানী না বলিয়া অজ্ঞানী বলাই যুক্তি যুক্ত, সুতরাং জ্ঞানীর কার্য্য ব্যক্তিগত স্বার্থকে মূলে রাখিয়া প্রবর্ত্তিত হইতে দেখা যায় না যখন পৃথিবীর অধিকাংশ লোক সার্দ্ধ ত্রিহস্তের অভিমান ভুলিয়া আপনাকে সকল লোকের আত্মা বলিয়া নিশ্চয় করিবেন, তখন আপনা হইতেই জগতের ব্যক্তিগত স্বার্থ মূলক জঞ্জাল মিটিয়া যাইবে তখন মানুষ আপনার তুলনায় সমস্ত লোকের সহিত ব্যবহার করিবে নিখিল প্রাণীতে আত্মভাব সুদৃঢ় হইলে মানুষের আর পর বা পরের বলিতে কিছুই থাকিবে না কারণ আত্মপর ভেদের মূলে অজ্ঞান জনিত দেহাত্মভ্রান্তি বিদ্যমান রহিয়াছে সেই ভ্রান্তি তিরো হিত হইলে ঐ ভেদও উঠিয়া যাইবে তখন কেবল চিদাত্মা ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছু থাকিবেনা যদিও অজ্ঞানী কখন জ্ঞানপ্রদীপ্ত সমতারাজ্যের সীমায়ও পঁহুছিতে পারে না তথাপি দূর হইতে এই রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং যশোগাথা শ্রবণ করিয়া ইহার জন্য লোলুপ এবং জ্ঞানীজনের অঙ্গুলি হেলনে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে বিশেষতঃ বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগবত ও মহানির্ব্বান তন্ত্র পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্য ধর্ম্ম গ্রন্থেই জ্ঞানের মাহাত্ম্য বর্ণিত এবং অজ্ঞানী দিগকে জ্ঞানীর আদেশে চলিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইলেকট্রন বা মৃত গ্রহ হইতে সজীবন গ্রহের আবির্ভাব বার্ত্তা শুনিয়া কিরূপে জ্ঞানী জগতের কুৎসা ও অজ্ঞানা জগতের প্রসংশা করা যায় ? তবে যাঁহারা প্রাচ্য ভাবের দায় এড়াইয়া প্রতিচ্য ভাবের গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছেন ; তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র পক্ষান্তরে আজ

পর্য্যন্তও যখন এরূপ কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বা রাজনীতিক ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাদ্বারা মানুষের আন্তরিক কালিমা ধৌত হইতে পারে, তখন কেমন করিয়া জ্ঞানী জগতের শাসন অবহেলা করিতে মানুষ প্রস্তুত হইবে? এবং কেমন করিয়াইবা অন্ধ গোলাঙ্গুল নীতিতে অজ্ঞানী মানবের আবর্জনা লইয়া বালকের ক্রীড়া করিতে থাকিবে? আর অন্তঃশুদ্ধি না হইলে যে জন সমাজের পরস্পর ব্যবহার সুশৃঙ্খলা ও আনুকূল্যের অনুবর্ত্তী হইবে তাহারও কোন প্রমাণ নাই কাজেই জ্ঞানী জগৎ এবং অজ্ঞানী জগতের মধ্যে এমন বিষম বন্ধুর এক প্রকাণ্ড অন্তরাল মনে হয় যাহা কোন উপায়ে সমতল হইয়া উভয়কে সমশ্রেণীর করিয়া লইতে পারে না।

বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ

মানুষ যে কেন বহির্জগৎকে অন্তর্জগৎ হইতে পৃথক মনে করে তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ইহাই মনে আসে যে, মন নিরপেক্ষভাবে বহির্জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে এইরূপ সংস্কার সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভাবগুলিকেই কেবল মানুষ মনের সম্পত্তি বলিয়া জানে এইজন্য সে অপরের নিকট হইতে নিজের ঐগুলির কোন খবর পায়না। নিজের অনুভূত বাহ্যজগৎ সম্বন্ধেও মানুষ যদি অপরের কাছে কোন সমাচার না পাইত তবে তাহাকেও মনোবিজৃম্ভিত বলিয়াই বুঝিয়া লইত কিন্তু তাহার সৌষুপ্তিক মনোবিলয়ের সময়ে বাহ্য জগৎটাকে সে যেরূপে দেখে সেইরূপ অপরেও দেখিয়া থাকে খবর পায়, তখন উহা যে তাহার মনেরই সম্পত্তি ইহাতে সে কিপ্রকারে প্রত্যয়ান্বিত হইতে পারে. পক্ষান্তরে সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভাবগুলি যেন শরীরের

ভিতরে থাকিয়া লীলা খেলা করে মনে হয় কিন্তু বহির্জগৎ সম্বন্ধে এইরূপ মনে হইলে লোক সমাজে উন্মত্ত বলিয়াই বিবেচিত হইতে হয় কারণ সুবৃহৎ পর্ব্বত এবং সমুদ্র প্রভৃতির নিকেতন এই বিশাল জগৎ যে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত কলেবরের অভ্যন্তরে থাকিতে পারে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব মন যে শরীরের ভিতরেই কোন স্থানে অবস্থিত থাকে তাহাও শরীরের বিনাশে মনের কোন কার্য্য না দেখাই বেশ বুঝাইয়া দেয় কাজেই যাঁহারা বাহ্যজগৎকেও মনোবিজৃম্ভিত মনে করেন, কৃতবিদ্য বা তত্ত্বজ্ঞানী হইলেও তাঁহাদের বাক্য আপ্ত বাক্য স্বরূপে ধরিয়া লইতে কেহই স্বীকার করিতে পারে না।

এ সকল কথা খামখেয়ালী বলিয়া বিবেচিত না হইলেও ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার কথা বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারা যায় না কেননা এ সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার একটিও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত নহে মন-নিরপেক্ষভাবে বহির্জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে এই সংস্কারটা যে ভ্রান্তির সহিত কোন সংশ্রব রাখে না তাহা নহে, তবে ইহা যে অনেকের মনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু তাহা হইলেও অসত্য কখনও সত্যের আদর পাইতে পারে না, বিচারশীল ব্যক্তির ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত। এইরূপে জাগ্রৎ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি তাহার সুখ দুঃখ সম্বন্ধে যেরূপ ঐ অবস্থাপন্ন অপর ব্যক্তির নিকট কোন খবর পায় না, সুষুপ্তিতে থাকিলে যে নিজের গৃহ উদ্যান প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে তাহাও অপর সুষুপ্ত ব্যক্তির নিকট জানিতে পারা যায় না ইহার তাৎপর্য্য এই যে, একব্যক্তি সুষুপ্তিতে পৌছিয়া তাহার মনের বিলয় করিয়া ফেলিলেও অপর জাগ্রৎ ব্যক্তির মন তাহার সাধের গৃহ উদ্যান প্রভৃতির রচনা করিয়া লয় কেননা প্রথমের ন্যায় দ্বিতীয়ও যদি সুষুপ্তিতে উপনীত হয় তবে সেও কেবল তমোগূঢ়তমই অনুভব করিতে থাকে বলিয়া তাহার নিকট হইতে

ঐ সম্পত্তির ঐ অবস্থার অস্তিত্ব সম্বন্ধে খবর পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভাব সুখ দুঃখগুলি শরীরের ভিতরে এবং সুবিশাল জগৎটা উহার বাহিরে থাকে মনে হইলেও কেবল সুখ দুঃখগুলিই মনসাপেক্ষ এবং বহির্জগৎ মন নিরপেক্ষ বলা যাইতে পারে না। এইজন্য যে, বহির্জগৎটা ইন্দ্রিয় বোধরূপ হওয়াতে সুখ দুঃখ প্রভৃতির ন্যায় উহাও মনসাপেক্ষই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। শরীরের বিশ্ববংশে মনের কোন কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এ কথা সত্য হইলেও শরীরের অভ্যন্তরে মন লুক্কাইত আছে, এরূপ ধারণা যুক্তির বহির্ভূত। কেনন মনই যে শরীরের জন্মদাতা, সুষুপ্তিতে মনের বিলয়ে শরীরের অপ্রতীতি ব্যাপারটাই এই তথ্য বুঝাইয়া দেয়। সুতরাং সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভাব গুলি মন হইতে যেরূপ আত্মলাভ করে বহির্জগৎও তদ্রূপই বটে।

যখন মনোবিজৃম্ভিত বস্তু মাত্রকেই অন্তর্জগৎ বলা যায়, এবং গৃহ, দারা প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই ইন্দ্রিয় বোধ বলিয়া মনোজনিত, কেননা মনের সাহায্য ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়বোধই আত্মলাভ করিতে পারে না, তখন বহির্জগৎ যে অন্তর্জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু ইহা প্রমাণিত হইবার নহে। তবে সুখ দুঃখ প্রভৃতি কেবল মনোবেদ্য, আর মণি মুক্তা প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা মনোবেদ্য এইরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু মন নিরপেক্ষভাবে মণি মুক্তা প্রভৃতি জিনিষগুলি বাহিরে থাকে বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঐগুলি কেবল মনের গোচর হয় মাত্র, এইরূপ ধারণা কখনও ভ্রান্তিমূলক না হইয়া পারেনা। যাহা হউক, মানুষ মাত্রই যে দার্শনিক চক্ষু লাভ করিবে এরূপ আশা কিছুতেই করা যায় না, সুতরাং বহির্জগৎ প্রকৃতপক্ষে অন্তর্জগতের অন্তঃপাতি হইলেও অদার্শনিক লোকেরা উহাকে পৃথক বলিয়াই ধরিয়া লইবে। অধিকন্তু ঐরূপ লোকের সংখ্যাধিক্য দর্শনে দার্শনিক যদি প্রকৃত তথ্য প্রচারে সঙ্কুচিত হন তাহা হইলে অন্ধ পরম্পরার অন্ধকার, এ নীতিতে জগৎ

ছাইয়া ফেলিবে বর্ত্তমান পৃথিবীতে যদিও এই অন্ধকার ব্যাপ্তির সঙ্কোচ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে তথাপি স্থানে স্থানে দার্শনিকের জ্ঞানালোকও দেখিতে পাওয়া যায়

এই সুবৃহৎ বহির্জগৎ যে মন হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে, স্বপ্ন অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে এ অবস্থায় মানুষ অসম্ভব জিনিষকেও সুসম্ভব করিয়া তুলে জাগ্রৎ অবস্থায় যাহার কল্পনা করিতেও সাহস হয় না, এরূপ বস্তুও স্বপ্নে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায় স্বপ্ন ব্যাপারটা যদিও জাগ্রদবস্থার আনুকূল্য হইতে সর্ব্বথা অব্যাহতি পায় না তথাপি স্বপ্নেও যে জীব জাগ্রৎ অবস্থার দৃষ্ট জিনিষগুলিকে বিশৃঙ্খল বা বিপরীত ভাবে অনুভব করিয়া থাকে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না কেননা জাগরিত অবস্থার বস্তুজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ দেশ কাল ও প্রকৃতি গত নিয়মের বন্ধন অপরিহার্য্য এ অবস্থার বস্তুজ্ঞানে সেরূপ নহে আর মানুষ সচরাচর এ অবস্থায় যেমন এক মুহূর্ত্তে সহস্র বৎসরের কৃত্য সম্পাদন করিয়া ফেলে, সেইরূপ এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরেও কোটি যোজন বিস্তৃত নগর এবং গগন মণ্ডলের উপরিভাগে সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেও ছাড়ে না কাজেই স্বপ্ন অবস্থায় যে জীব নূতন ভাবে জগৎ রচনা করিয়া লয় ইহা নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে

যখন স্বপ্ন জগতের আত্মলাভ মন হইতেই হয় ইহাতে কোন সন্দেহ রহিল না, তখন সমরূপে বস্তু প্রতীতির পুনরাবৃত্তি দেখিয়া মন-নিরপেক্ষ কিম্ভূত কিমাকার একটা স্বতন্ত্র বহির্জগৎ খাড়া করিয়া লওয়া কখনই বিচারশীলের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না সমভাবে বস্তু জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি স্বপ্ন অবস্থাতেও হইয়া থাকে কেননা একই প্রকার স্বপ্ন ও বারম্বার দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপে কোন কোন ভ্রান্তিও সম ভাবের হইতে দেখা যায় এইজন্য একই ভাবে বস্তু জ্ঞানের

বারম্বার আবৃত্তিকে মনোনিরপেক্ষ সত্যতার নিয়ামক বলিতে পারা যায় না এই স্থলে জাগ্রদবস্থার ইচ্ছানুসারে বস্তু অনুভবের কথা পাড়িলেও কোন ফলোদয় হইবার নহে কেননা ইচ্ছানুসারেও দূরস্থ আকাশে নিলিমার ভ্রান্তি হইতে দেখা যায়। কাজেই বহির্জগৎ ইচ্ছানুসারে একই ভাবে আমরা বারম্বার দেখি এইজন্য উহাকে মনো নিরপেক্ষভাবে সত্য বলা উচিত এইরূপ আপত্তির অবসর রহিল না।

মানুষের মনই যে পরিণাম বৈচিত্রে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, অজ্ঞানী ইহা বুঝিতে না পারিয়া বাহিরে স্বতন্ত্র জগতের কল্পনা করে একমাত্র ইহাই নহে, মন শরীরের ভিতর থাকিয়া এ জগতের সকল খবর আপন মহিমায় আনিয়া দেয় এইরূপ ধারণাও করিয়া থাকে তাঁহারা এই কল্পনা ও ধারণার এরূপ গোঁড়া হইয়া পড়ে যে, প্রায়শঃ কোন উপদেশই তাঁহাদের পক্ষে কার্য্যকরী হয় না • কাজেই দার্শনিকের যুক্তি এবং জ্ঞানীর অনুভবকে তাহারা অকিঞ্চিৎকর বলিযাই মনে করে এইরূপ অবস্থাতে যদিও তাহাদের সম্বন্ধে বিনা ওজরে জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইবার আশা করিতে পারা যায় না, তথাপি বারম্বার তাহাদিগকে জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য তাহাতে কুসংস্কারের বন্ধন শিথিল হইতে পারে, কেননা সত্যের মহিমাই এইরূপ

মনের অনন্তশক্তি সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় মন না করিতে পারে এমন কোন কার্য্যই দেখিতে পাওয়া যায় না গিরিরাজ হিমালয় যেখানে উত্তুঙ্গ-তুষারাবৃত-শৃঙ্গ দেখাইয়া ভাবুক বৃন্দকে মোহিত করিতেছে, নিমেষের মধ্যে মন সেই স্থলেই সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের লীলা-রস রঙ্গ রচনা করিতে পারে কাজেই বাধ্য হইয়া মনকে সর্ব্বশক্তিমান উপাধি দিতে হয় প্রকৃত পক্ষে সকল বিষয়ে শক্তি ইহারই নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন হইতে দেখা যায় এইজন্য

ইহাতেই ঈশ্বর শব্দের অভিধেয় সঙ্গতি হইতে পারে। কিন্তু সুষুপ্তির কথা চিন্তা করিলেই ইহার চির অমরত্ব নষ্ট হইয়া যায় আর সগুণ ব্রহ্ম যে সত্য ■ মিথ্যা উভয় বিমিশ্রিত ইহাতেই বা কি সন্দেহ আছে? কেননা অখণ্ড নির্ব্বিশেষ চৈতন্য ও পরিবর্ত্তন প্রকৃতি, অনির্ব্বচনীয় মায়ার মধ্যে প্রথম সত্য এবং দ্বিতীয় মিথ্যা হওয়াতে এই বিষয়ে কোন অসঙ্গতি দোষ আসিতে পারে না যদিও এইরূপ চৈতন্য নিরন্তর মায়ার অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি ব্যাপারে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন, তথাপি আপাত দর্শী এই গূঢ় রহস্যের ভেদ করিতে না পারিয়া মায়ার দোষ গুণ তাঁহার উপর আরোপ করিতে ছাড়েনা যাহাই হউক কার্য্যকারিণী এবং পরি-বর্ত্তনোন্মুখী মায়াই যে ব্যষ্টিভাবে মন আখ্যালাভ করিয়াছে তাহা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না এই জন্য যে, মায়া ও মনের কার্য্যতঃ স্বরূপতঃ বা স্বভাবতঃ কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না লক্ষণ দেখিয়াই বস্তুনির্দ্দেশ করিতে হয় এজন্য বাধ্য হইয়া মনকে মায়া বলিতে হয় মায়ার যে গুণ ধর্ম্ম স্বভাব ও স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মনেও অবিকল তাহাই দেখিতে পাওয়া যায় কাজেই মন কেবল মায়ার বিবরণ মাত্র তবে যে অন্তরিন্দ্রিয় বিশেষ একটা নিত্য মনের কথা শুনিয়া আসা যাইতেছে, তাহা কখনও বিশেষ দর্শনের কথা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না কেননা বিশেষ দর্শনে এক চিন্ময় ব্রহ্ম ব্যতীত অপর সকলেই অনিত্য ও স্বয়ং সত্তাশূন্য বলিয়া সাব্যস্ত হয় পক্ষান্তরে মন যে নিত্য নহে, তাহা তাহার বিলয়কারিণী সুষুপ্তিই বুঝাইয়া দেয়

অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মূল উপাদান মায়া পরিবর্ত্তন উৎপাদন-আরম্ভ করিলেই মন বলিয়া প্রথিত হইয়া পড়ে। কাজেই অন্তর ও বহির্জগৎ উভয়ই মন হইতে আবির্ভূত হয় যদ্যপি মনকেও অন্তর্জগতের অন্তঃপাতী বলাই উচিত তথাপি আলোচ্য বিষয়টাকে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইবার জন্য তাহাকে উভয়ের কারণ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া

যাইতেছে মনোজন্যত্ব প্রতীতির পূর্ব্বে বা পরে অস্থায়িত্ব ও অনির্ব্বচনীয়তা সম্বন্ধে উভয়ের ভিন্নতা না থাকিলেও নিরবচ্ছিন্ন মনোবেদ্যত্ব ও বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা মনোবেদ্যত্ব অংশে উভয়ের বৈষম্য দেখিতে পাই অর্থাৎ সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভাব সমূহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল মনের দ্বারাই প্রতীয়মান হইয়া থাকে এবং মানুষ, গৃহ, দারা প্রভৃতি বহির্ব্বিষয় গুলিকে ঐ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনের দ্বারা অনুভব করে আর এই বৈষম্যের জন্য যদি সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে আন্তর এবং গৃহ, দারা প্রভৃতিকে বাহ্য বলা যায় তবে কোন বিরোধ আসিবার নহে বিরোধের মূল ভিত্তি মন-নিরপেক্ষভাবে বহির্জগৎটা সদা বর্ত্তমান থাকে এইরূপ অপরূপ সংস্কার। যেরূপ সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভাবগুলি মন হইতে আত্মলাভ করিয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া যায় মণি মুক্তা প্রভৃতি বহির্ব্বিষয়ও সেইরূপই বটে আন্তরিক ভাবের ন্যায় বাহ্য বিষয়ও কেবল প্রতীতির সময়েই বর্ত্তমান থাকে কিন্তু প্রমাণ না পাইয়াও মানুষ অন্ধ পরম্পরায় বাহ্য বস্তুর অজ্ঞাত-সত্তা মানিয়া লয় এ বিষয় সবিশেষ ভাবে পরে আলোচিত হইবে এজন্য সংক্ষেপে বলা গেল।

অন্তর্জ্জগৎ হইতে বহির্জ্জগৎকে পৃথক বিবেচনা করিবার মূলে একমাত্র ঈশ্বরই বাহ্যজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এইরূপ সংস্কারও দেখিতে পাওয়া যায় আর এই সংস্কারটা আস্তিক-সমাজে এত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, মায়াবাদের সংস্কার ইহার সহিত সমরে সহজে বিজয় লাভ করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি সত্য প্রচারে বিমুখ হওয়া একান্ত অকর্ত্তব্য বিবেচনায় দার্শনিককে বাধ্য হইয়া এ সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিতে হইবে যদিও এই সংস্কারটা অনেক শুভফল উৎপাদন করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, তথাপি মানুষ যে ইহার জন্যই প্রকৃত সত্য হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাইতেছে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক কেন না ইহা নানাত্ব

ও অসত্যে সত্য ভ্রান্তির বন্ধনে মানুষকে বাঁধিয়া রাখে কাজেই ঈশ্বর সৃষ্টি ও জীব সৃষ্টির বিসম্বাদ মনে খাড়া করিয়া একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই সত্য এবং তদ্‌ব্যতিরিক্ত সমস্তই প্রাতিভাসিক সুতরাং মিথ্যা এই সত্যের অপলাপ করিতে লোকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আপনাকে লিপ্ত না করিয়া থাকিতে পারে না কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রত্যেক ব্যক্তির মনই একত্রিভূত হইলে ঈশ্বর হইয়া দাঁড়ায় কেন না মন ছাড়া অপর কোন স্রষ্টা বিবেক অনুসন্ধানে পায়না যদিও একমন অপর মন সম্বন্ধে কোন খবর রাখে না বলিয়া মনের একত্বই প্রমাণিত হইয়া পড়ে তথাপি জিজ্ঞাসুর সুবিধার্থে আপাততঃ মনকে বিভিন্ন বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতেছে যাহা হউক, মন সমষ্টি ব্যতিরেকে বিশ্বস্রষ্টা স্বতন্ত্র ঈশ্বর দার্শনিক যুক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় না, সুতরাং ভক্ত-মণ্ডলী যে অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই চলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই মনের প্রেরক ঈশ্বর বলিয়া মন হইতেই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের আবির্ভাব হইয়া থাকে এরূপ যাঁহারা বুঝিয়া লন, তাঁহারা ভক্ত মণ্ডলীর ন্যায় গোড়ামি না দেখাইলেও অন্ধ বিশ্বাসের দায় হইতে সর্ব্বথা অব্যাহতি পান না এই জন্য যে, মনের প্রেরক স্বরূপে এক জন ঈশ্বর কল্পনা করা কেবল অন্ধ বিশ্বাসেরই ফল এই শ্রেণীর আস্তিক দার্শনিকগণ অপরাপর বিষয়ে দার্শনিক যুক্তির সমাদর করিলেও ঈশ্বর সম্বন্ধে কেবল অন্ধ বিশ্বাসেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে আস্তিক সমাজে তাঁহারা যশস্বী হইলেও নিজের বিশুদ্ধ দার্শনিক ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই, কেন না যাহা যুক্তিদ্বারা সমর্থিত না হয়, প্রকৃত দার্শনিক কখনও এরূপ তত্ত্ব নিরূপণ করেন না।

মনের স্বরূপ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সাব্যস্ত হয় যে, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সমষ্টি ব্যতিরেকে তাহার অন্য কোন স্বরূপ

নাই। যদিও সচরাচর আপাতদর্শী লোক আন্তরিক ভাব সমষ্টিকেই মনের স্বরূপ বলিয়া থাকে কিন্তু বিশেষদর্শী উভয় জগতের সংহতিকেই মনের স্বরূপ বলিয়া জানেন উপনিষদে যে কেবল আন্তরিক ভাব গুলিকেই মন বলা হইয়াছে তাহার মূলে অবিশেষদর্শীর মনোরঞ্জন-নীতি রহিয়াছে কারণ, তাহারা বাহ্য বস্তুর ব্যবহারিক সত্তায় এরূপ প্রত্যয়ান্বিত যে, একবারে ব্রহ্মাতিরিক্ত জিনিষ মাত্রকে মনোময় বলিয়া ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না পরন্তু দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ যে বেদান্তের মুখ্যসিদ্ধান্ত, প্রকরণ গ্রন্থের সহিত পরিচয় না ঘটিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না যাঁহারা উক্ত গ্রন্থ না পড়িয়া উপনিষদ ভাষ্য ও শারীরক ভাষ্য অধ্যয়ন করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্যবহারিক-সত্তা ও নানাজীববাদের প্রলোভনে পড়িয়া বিশুদ্ধ অদ্বৈত সিদ্ধান্তের সঙ্কোচ করিয়া ফেলেন অতএব বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলি ভাল করিয়া না পড়িলে অদ্বৈত বাদের গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। কাজেই তত্ত্ব জিজ্ঞাসুকে সাবধান হইতে হইবে যেন নির্ম্মল অদ্বৈত বাদের উপর ভেদ বাদের কলঙ্ক না লাগান

জ্ঞাতসত্তা ও অজ্ঞাতসত্তা।

অজ্ঞাতসত্তা কথাটা কেবল কথার কথা হইলেও অনেকেই ইহাকে সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া রহিয়াছেন এবং এই ধারণার মহিমায় তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ না পাইয়াও তাহার বন্ধনে আপনাকে এত শক্ত করিয়া বাঁধিয়াছেন যে, উহা ছিন্ন করা একটি কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে মানুষ সহস্র-যোজন দূরে থাকিয়াও নিজের গৃহ-স্থিত জিনিষ গুলিকে অজ্ঞাতসত্তার আলোকে আলোকিতই মনে করে, ঐ গুলি যে অসত্তার অন্ধকারে আছন্ন ইহা সে ক্ষণকালের জন্যও

ভাবিয়া দেখেনা কেন না, সে গৃহে যাইয়া ঐ গুলিকে একই ভাবে বারম্বার দেখিয়াছে মুক্ত গৃহের জিনিষ গুলির বিন্যাস সম্বন্ধে অযথা-ভাব তাহার প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি হইতে পারে, কিন্তু বদ্ধ-গৃহের বস্তু সম্বন্ধে বিন্যাস-বিপর্য্যয় সে কদাপি দর্শন করে নাই কাজেই এই রূপ অবস্থাতে কোন জিনিষ দেখিয়াই তাহার অজ্ঞাতসত্তা উড়াইয়া দেওয়া যায় না আর সুষুপ্তির সময় যখন অজ্ঞান অন্ধকার মানুষকে ছাইয়া ফেলে, তখন কোন বস্তু জানিতে না পারিলেও উহার অবসানে, জাগ্রদবস্থায় আসিয়াই সে পূর্ব্ববৎ উহা দেখিতে পায়; এই জন্যও অজ্ঞাতসত্তা মানিতে হয় মানুষ একই জিনিষকে পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছে, পরে যদি সেইরূপ না দেখিত, তবে অজ্ঞাত অবস্থাতে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবশ্যই সে সন্দেহ করিত কিন্তু যখন মানুষ এক ভাবে এক স্বরূপে বস্তুর পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করিতেছে, তখন না দেখিবার সময় যে উহা অভাবের কবলে পতিত হয় তাহাতে কিরূপে তাহার প্রত্যয় রাখিতে পারে?

অজ্ঞাতসত্তাবাদীর নিকট এইরূপ অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহার মূলে তুল্য ভাবে বস্তু জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি জনিত ভ্রান্তিই ধরা পড়ে কেননা অজ্ঞাত অবস্থাতে বস্তুর সত্তা সম্বন্ধে মানুষ কোন প্রমাণ পায়না, কেবল অন্ধ পরম্পরার বশবর্ত্তী হইয় বস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞাতসত্তা মানিয়া লয় একই জিনিষকে দশ জনে বারম্বার একই ভাবে দেখে এইরূপ মনে করিয়া অবিশেষ-দর্শী নিজের মনঃ কল্পিত ক্ষণ ভঙ্গুর জিনিষকেও স্থায়ী বলিয়া জানে কিন্তু আবার এইরূপ উদাহরণ ও পাওয়া যায় যে একই বস্তুকে দশ জনে দশ রকম দেখে যাহা হউক, অজ্ঞাতসত্তা যে কিছুতেই ব্যাহতি দোষ হইতে অব্যাহতি পায়না ইহা অতীব সত্য কেননা জ্ঞান ব্যতিরেকে সত্তা সিদ্ধি না হওয়াতে সত্তা অজ্ঞাত রহিয়াছে

এই কথাটার অভিধেয় সঙ্গতিহ হইয়া উঠে না আর দূরাবস্থিত ব্যক্তির গৃহস্থিত সমগ্রী যে দস্যু-তস্করের সম্পত্তিতে পরিণত হয় অথবা ভূমিকম্প প্রভৃতি ঘটনায় মূলাধারের সহিত রসাতলে চলিয়া যায় সময় সময় তাহাও শুনিতে পাওয়া যায় এইরূপে সুষুপ্তি অবস্থায় যে জিনিষের খবর পাওয়া যায় তাহা অপর জাগ্রৎ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় বোধ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, কেননা ঐ ব্যক্তিও সুষুপ্ত অবস্থায় উপনীত হইলে কেবল শুচিভেদ্য তিমিরই দেখিতে পাইবে। পক্ষান্তরে ভ্রান্তি-স্থলেও বস্তু একভাবে বা স্বরূপে পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয় বলিয়া এক ভাবে বা স্বরূপে বস্তুর উপলব্ধি তাহার সত্যতা ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে হইতে পারেনা কাজেই আমরা যে অসকৃৎ এক ভাবে বস্তু উপলব্ধি করিয়া তাহার অজ্ঞাতসত্তায় প্রত্যয়ান্বিত ইহা একটা শ্লাঘার কথা নহে

অজ্ঞাতসত্তায় প্রত্যয়ান্বিত হইয়া পড়িলে বিজাতীয়-ভেদের দায় এড়াইয়া উঠা সহজ ব্যাপার নহে কেন না চিন্ময় আত্মসত্তাইযে বস্তু মাত্রের সত্তা ইহাতে এই সত্যের সঙ্কোচ না হইয়া থাকেনা যদিও কনক কান্তা প্রভৃতির অনিত্যতায় অজ্ঞাতসত্তাবাদীও বিশ্বাস রাখে তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হওয়াতে এই গুলিকে সাময়িকভাবে সত্য বলিয়াই মনে করে। অর্থাৎ চিরকালের জন্য সংসার সত্য না হইলে ও নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী ভাবে বর্ত্তমান থাকে। কাজেই ঐ সময় পর্য্যন্ত ঐ গুলি যে ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র সত্তাশালী, এই ধারণা না করিয়া তাহারা কিছুতেই থাকিতে পারে না। এমন কি জড়সত্তার প্রলোভনে পড়িয়া সর্ব্বব্যাপিণী ব্রহ্মসত্তাকে ও ভুলিয়া যায় যে জ্ঞানময়ী সত্তা নিখিল বস্তুর প্রাণ, বস্তু উপলব্ধি সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পায়না প্রকৃতপক্ষে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, অজ্ঞাতসত্তার অনুরাগ বাড়িয়া উঠিলে মানুষ, সকল জিনিষের আসল স্বরূপ যে ব্রহ্ম ইহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারেনা কেননা উহা তাহাদিগকে

জড়ের চতুঃসীমার বাহিরে যাইতে দেয় না আর জড়ের সীমার বাহিরে যাইতে না পারিলে ব্রহ্মই আবরণের অন্তরালে থাকিয়া যান, কেননা তাঁহার স্বরূপের সঙ্গে জড়ের কোন সংশ্রব নাই যাহা জড় তাহাই মায়িক সুতরাং মায়াতীত এবং শুদ্ধ-চিন্ময় হওয়াতে তাঁহাকে জড়-চৈতন্য মিশ্রিত মনে করা অজ্ঞানেরই পরিচায়ক

অজ্ঞাতসত্তায় অন্ধবিশ্বাস পাকিয়া উঠিলেই মানুষ ক্রমনীতিতে জড়বাদী হইয়া পড়ে কেননা ঐরূপ সত্তা জড় বস্তু সম্বন্ধেই খাটে যদিও জড় পদার্থকে প্রত্যক্ষতঃ ধরিয়া লইতে পারা যায় না, তথাপি বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বোধের কারণ রূপে উহা কল্পিত হইয়া থাকে তবে ইহা সত্য যে জড় অতীন্দ্রিয় বলিয়া অজ্ঞেয়তার অন্ধকার হইতে কখনও অব্যাহতি পায় না যাহাই হউক, অজ্ঞাতসত্তাবাদ যে মানুষকে অন্তর্মুখ হইতে দেয়না ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ইহা বহির্ব্বস্তুর প্রতি লোকের অনুরাগ বাড়াইয়া দেয় কেবল ইহাই নহে, ইহাতে প্রত্যয়ান্বিত হইয়া পড়িলে বাহ্য সৌন্দর্য্যের খুঁটিনাটি লইয়া মানুষ এত ব্যতিব্যস্ত হয় যে অন্তর্মুখ হইতে তাঁহার অবকাশই ঘটিয়া উঠেনা। এমন কি প্রতীতির পূর্ব্বে বা পরে যাহার অস্তিত্বের কোন খবর পাওয়া যায়না তাহাকেও মানুষ অন্ধবিশ্বাসের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া সত্য বলিয়া ধরিয়া লয় যদিও এই ধারণা হইতে সংসারের অনেক উন্নতি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা যে ধীরে ধীরে মানুষ কে অজ্ঞাতসারে পশুভাবের আবর্জ্জনাময় পথে লইয়া যাইতেছে ইহা অস্বীকার করা যায় না আর ইহাতেই বা কি সন্দেহ আছে যে, মানুষ যদি বহির্ব্বস্তুকে স্থায়ী ভাবে সত্য বলিয়া বুঝিয়া লয় তবে সে কেন অন্তরতম সূক্ষ্মতত্ত্ব আবি-ষ্কারের জটিলতা লইয়া মাথা ঘামাইতে যাইবে? কেননা সহজে যাহা আয়ত্ত হয়, তাহার দিকেই লোক বিনা আপত্তিতে চলিতে

থাকে এইরূপে যে দিন দিন লোকে আধ্যাত্মিক বিষয় ভুলিয়া যাইতেছে তাহার যথেষ্ট উদাহরণ ও পাওয়া যায়

অজ্ঞাতসত্তাবাদী ইহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন" যে, সত্ত' জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত জিনিষ নহে কেন না তাহার মনে এইরূপে কুসংস্কার জাগিয়া গিয়াছে যে, জ্ঞান নিরপেক্ষ ভাবে সত্তা জড়-বস্তুর অভ্যন্তরে লুকায়িত রহিয়াছে যদিও জ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত সে উহাকে ধরিয়া লইতে পারেনা তথাপি অবিবেকের প্রলোভনে পড়িয়া অজ্ঞাত অবস্থাতেও উহাকে মানিয়া লয় কোনরূপ প্রমাণ দিতে না পারিলেও অন্ধ বিশ্বাসের প্রভাবে উহার অভাব আশঙ্কা তাহার মনে আসেনা যাহাই হউক, অজ্ঞাতসত্তাবাদ যে জ্ঞান হইতে সত্তাকে পৃথক করিয়া দেয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু সদ্বিবেকের উদয় হইলে উহার ভিত্তিটাই ভাঙ্গিয়া যায়, কেননা উহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেয় যে, যখন জ্ঞান ব্যতিরেকে অপর কোন স্থায়ী জিনিষ নাই, তখন বাধ্য হইয়া জ্ঞানকেই সত্তা বলিতে হয় আর জ্ঞান ব্যতীত সত্তা সিদ্ধ না হওয়াতে এবং জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ এই জন্য প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেক নীতিতে সত্তা যাইয়া জ্ঞানেই পরিণত হইয়া পড়ে অর্থাৎ জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় এবং তদতিরিক্ত সত্তার কোন অবশ্যম্ভাবিত্ব অনুসন্ধানে আসে না কাজেই জ্ঞান অবিনাশী বলিয়া তাহাকে সত্তা বলাতে কোন অন্যায্যতা দোষ আসিতে পারে না যেরূপেই বিচার করা যাউক, সত্তা যে জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র জিনিষ নহে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া যায়. সত্তা ও জ্ঞানের তাদাত্ম্যভাব কেবল যুক্তি ও অনুভব হইতেই জানিতে পারা যায় এরূপ নহে,-''সত্যং জ্ঞ ন মনন্তং ব্রহ্ম' এই উপনিষদ ■ ইহার সমর্থন করে সুতরাং প্রতীয় মান বস্তুর সত্তা যে প্রতীতিমাত্র ইহা বুঝিতে বাকি রহিলনা এবং এই জন্যই পরমার্থ ও প্রাতীতিকসত্তা ব্যতীত যে একটা তৃতীয়

ব্যবহারিক-সত্তা আছে এইরূপ বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হইয়া পড়িল

ব্যবহারিক-সত্তাবাদ যে অজ্ঞাতসত্তাবাদেরই পরিণাম বিশেষ তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়; কেননা উভয়েই সম-প্রকৃতিক তবে প্রাতীতিক সত্তাকে বিশিষ্ট অবস্থায় ব্যবহারিক সত্তা বলা যাইতে পারে অর্থাৎ তুল্যভাবে যাহার জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি হয় তাহার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে সংক্ষেপশারীরক প্রণেতা প্রভৃতি মহাপুরুষ যে ব্যবহারিক-সত্তা অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন তাহাও প্রাতীতিক সত্তারই অন্তঃপাতী আর স্বতন্ত্র একটা ব্যবহারিক সত্তা খাড়া করিলে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ যে ভেদবাদের সংশ্রবে কলঙ্কিত হইয়া পড়ে তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত সুতরাং তত্ত্বদর্শী কৃতবিদ্য বৈদান্তিকের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার কেবল অজ্ঞানী পরিতোষ নীতিতেই হইয়াছে এই জন্য যে, শুক্তি রজত প্রভৃতির ন্যায় কনক কান্তা ও মণি মুক্তা প্রভৃতিকে ভ্রান্তি বিলসিত বলিলে অজ্ঞানীর অবলম্বন সমূলে ভাঙ্গিয়া যায় আর এই গুলিকে শুক্তি রজত প্রভৃতি ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত বস্তু হইতে পৃথক বলিয়া উল্লেখ করাতে তাহাদের হৃদ্‌বোধ জন্মাইবার পথ কণ্টকাকীর্ণ হয় না যাহা হউক, প্রাতিভাসিক হইয়া ও যে মণি মুক্তা প্রভৃতি বস্তুগুলি একই ভাবে বারম্বার প্রতীয়মান হইয়া থাকে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ যদি শুক্তি রজত প্রভৃতি বস্তু গুলি ও প্রতীতির বিষয় হইত তবে ঐ গুলিকে অজ্ঞানীরা কখন ও ভ্রান্তি-বিলসিত বলিতে সাহস করিত না যেরূপ মন্দান্ধকারে কখন শুক্তি রজত দেখিয়া ও বিশেষ দর্শনের পরক্ষণে না দেখিয়া মানুষ অপ্রমা-প্রসূত বলিয়া ধারণা করিয়া লয় সেইরূপ বারম্বার একই ভাবে কনক কান্তা প্রভৃতি বিষয় দেখিয়া সত্য বস্তুতে পরিণত না করিয়া থাকিতে পারে না শুক্তি রজত

ও মণি মুক্তা উভযেরই জ্ঞাতসত্তায অর্থাৎ জ্ঞানসমকালিন অস্তিত্বে পার্থক্য না থাকিলেও প্রথম বিশেষ দর্শনের পরে প্রতীযমান না হওয়াতে অসত্য এবং দ্বিতীয একই ভাবে অসকৃৎ প্রতীতি-গোচর হয বলিযা 'সত্য, অজ্ঞানীরা মনে করে কিন্তু মরুমরীচিকাভ্রা'ও অজ্ঞানীর ও বারম্বার একই ভাবে হইতে দেখা যায

অজ্ঞাতসত্তাবাদের ন্যায জ্ঞাতসত্তাবাদে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের অঙ্গে ভেদ-বাদের কলঙ্ক লাগিবার সম্ভাবনা নাই কারণ ইহাতে ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্রই স্বতন্ত্র সত্তা শূন্য সুতরাং রজ্জুসর্পের ন্যায মিথ্যা যদ্যপি সত্তা ব্রহ্মরূপ হওযাতে তাহার পারমার্থিক ও প্রাতিভাসিক-রূপ ভেদ অসম্ভব, তথাপি মাযিক বস্তু বিভিন্নরূপে প্রতীযমান হয বলিযা আপাততঃ উহার প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকৃত হইযাছে . অধিকন্তু নিবিষ্ট মনে বিচার করিযা দেখিলে প্রাতিভাসিকসত্তাটা যাইযা ব্রহ্ম সত্তাতেই পরিণত হইয়া পড়ে অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্তাই মাযিক বস্তুর আসল স্বরূপ হইযা দাঁড়ায চিন্ময়ীসত্তার আধারে মহামাযা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ প্রভৃতির আকারে পরিণত হইযাই বিলীন হইয়া যাইতেছে মাযার প্রবাহ কখন বন্ধ না হইলেও উহার স্থাযী ভাবের অভাবই দেখিতে পাওযা যায যদিও অবিবেকের প্রলোভনে পড়িযা মায়াকেও লোকে স্থায়ী ভাবাপন্নই মনে করে তথাপি তত্ত্বজ্ঞানী মায়ার সকল ক্রিযাকেই তন্ন তন্ন করিযা বুঝিযা লন। এমন কি নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থায উপস্থিত হইয়া তাহাকে ব্রহ্মেই বিলীন করিযা ফেলেন কেবল অসমাহিত বা অসুষুপ্ত অজ্ঞানীর নিকটেই তাহার স্পর্দ্ধা দেখিতে পাওযা যায, কেননা জ্ঞানী ব্যুত্থান অবস্থাতেও মাযাকে মিথ্যা বলিযাই জানেন অবশ্যই অজ্ঞানীর ন্যায়রূপে জ্ঞানীও মাযার খেলা দেখিতে পান বটে, কিন্তু কখনও উহাকে সত্য মনে করিয়া আপন জ্ঞানের অপলাপ করেন না দূরস্থ

আকাশের নীলিমা সংগ্রহের জন্যও তিনি কখন বেলুন উড়াইতে প্রস্তুত হন না

প্রকৃত পক্ষে মায়িকবস্তু সম্বন্ধে শুক্তি রজত ও শুক্তি ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত বস্তুর ন্যায় মিথ্যা বোধ না জন্মিলে জ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। যাহার ভ্রান্তি বিলসিত জিনিষে অস্থায়িত্ব কিন্তু মণি মুক্তা প্রভৃতিতে স্থায়িত্ববোধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, শাঙ্করভাষ্য ও অদ্বৈতসিদ্ধি পড়িলেও তিনি অজ্ঞানের কলঙ্ক কালিমা কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারেন না কাজেই ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর প্রাতীতিক সত্তার অটল বিশ্বাসের উপরেই জ্ঞানত্ব নির্ভর করিতেছে তবে বেদান্ত সম্বন্ধে বহিরঙ্গ তত্ত্বের কথা পাণ্ডিত্য অনভিজ্ঞ সমাজের মনঃসমুদ্রকে তরঙ্গায়িত করার বিষয় স্বতন্ত্র। অবশ্যই বাচনিক-জ্ঞানীও সময় বিশেষে সাময়িক ভাবে, ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু বিশেষ দর্শীর নিকটে তাহার সকল রহস্যই ব্যক্ত হইয়া পড়ে তিনি আপনার প্রকৃত ভাবকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে যতই উপায় উদ্ভাবন করেন, বিশেষদর্শী উহাকে ততই সহজে ধরিয়া ফেলিতে সক্ষম হন কারণ, বিশেষদর্শী জ্ঞানের ও অজ্ঞানের সমস্ত ধর্ম্মের সঙ্গে এতদূর পরিচিত যে, তাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষু কখনই প্রতারিত হয় না।

তত্ত্বদর্শন না হইলে জ্ঞাতসত্তাবাদের মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না, এই জন্য অতত্ত্বদর্শীরা জ্ঞাতসত্তাবাদকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেও প্রমাণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেই নিরস্ত হইয়া পড়ে তথাপি তাহারা অন্ধ বিশ্বাসের আশ্বাস বাণীতেই ভুলিয়া থাকে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে জ্ঞাতসত্তাবাদের নিখিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে না পারিলে অদ্বৈততত্ত্বই মানব বুদ্ধির অগম্য থাকিয়া যায় কেন না, স্বতন্ত্র অজ্ঞাতসত্তারভাব মনে আসিলেই বিজাতীয়-ভেদের আশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হয় যাহা

হউক, জ্ঞাতসত্তাবাদ যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মায়িক বস্তুর স্থায়িত্ব-ভ্রান্তি হইতে যে অব্যাহতি পাওয়া যায় ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই থাকে না, এই জন্যই অধিকাংশ নিষ্ঠাবান-বৈদান্তিককে জ্ঞাতসত্তাবাদী হইতে দেখা যায় জ্ঞাতসত্তাবাদ যে বেদান্তের মুখ্য-সিদ্ধান্ত হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, প্রকরণগ্রন্থ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায় ফল কথা, মায়িক বস্তুর প্রতীতির পূর্ব্বে বা পরে যখন তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না, তখন বাধ্য হইয়া ঐ বস্তুর জ্ঞাতসত্তা অর্থাৎ জ্ঞানসমকালিন সত্তা স্বীকার করিতে হয়। যাহারা প্রমাণ না পাইয়াও অন্ধ বিশ্বাস বা কল্পনাবলে বস্তু স্বীকার করিতে অভ্যস্ত কেবল তাহারাই কিম্ভূত কিমাকার অজ্ঞাতসত্তা খাড়া করিয়া মায়িক জিনিষের বন্ধনে পড়িয়া থাকে কেন না ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু মাত্রই প্রাতীতিক, এই সত্যে নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি আনিতে পারিলে, স্বতঃই মায়ার বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় যেরূপ ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত বস্তুকে প্রাতিভাসিক জানিয়া কেহই তাহার তরে লালায়িত হয় না, মণি মুক্তা প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেইরূপই বটে কেই বা জানিয়া শুনিয়া ও মরিচিকার জলাধারের সত্বাধিকারী হইতে ইচ্ছা করে? মানুষ তুল্য ভাবে বারম্বার বস্তু দেখিয়া অন্ধপরম্পরা ক্রমে তাহার অজ্ঞাতসত্তায় প্রত্যয়ান্বিত হইয়াপড়ে এবং প্রমাণাভাবের ঘোর অন্ধকারেও অন্ধ বিশ্বাসের খদ্যোত দেখিয়া বন্ধনের কণ্টকাকীর্ণ গহ্বরের দিকে এমন দ্রুত-বেগে ধাবিত হয় যে বিশেষদর্শীর উপদেশও তাহাদের নিকট নিষ্ফল হইয়া থাকে। তবে ইহাও সত্য যে কেহ কেহ ঐ খদ্যোতের অস্ফুট আলোকে গহ্বরের অস্পষ্ট আকৃতি দেখিয়া আতঙ্কিত হয় এবং স্বীয় অন্যায় কার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া অনুতপ্ত হইতে থাকে

জ্ঞাতসত্তাবাদীর যুক্তি প্রমাণের বর্ষণে অজ্ঞাতসত্তাবাদী আপন মত সমর্থনে যখন অক্ষম হইয়া উঠেন তখনই তাঁহারা বলিয়া থাকেন

যে, না দেখিবার সময় জিনিষ বর্ত্তমান না থাকিলে দেখিবার সময় উহা কোথা হইতে আসে? যদি জ্ঞাতসত্তাবাদী বলে যে, আকাশের নীল-বর্ণ এবং মরিচিকার জল কোথা হইতে আসে? তখন অগত্যা বিশ্বাসের শরণে আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পড়েন বিশ্বাস যুক্তিবাদীকে নীরব করাইবার জন্য অদার্শনিক সমাজের এক প্রধান সাধন যাহা হউক, জ্ঞাতসত্তাবাদেই যে বিশুদ্ধ অদ্বৈত সিদ্ধান্তের সুব্যাখ্যা হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এই জন্যই বেদান্তের প্রকরণে দেখিতে পাই, 'আত্মন্যেব জগৎ সর্ব্বং দৃষ্টিমাত্রং সতর্ককং উদ্ভূয় স্থিতিমাস্থায় বিনশ্যতি মুহুর্মুহুঃ

একজীববাদ ও নানাজীববাদ।

শারীরিক ও মানসিক অবস্থার দিক দিয়া দেখিলে, জীবের নানাত্ব আপাততঃ প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে এই জন্য যে, ব্যক্তিভেদে উভয়ের ভিন্নতা অনুসন্ধানে পাওয়া যায় রাম ও শ্যামের চৈতন্যগত কোন পার্থক্য বুঝিতে না পারিলেও মন এবং শরীর সম্পর্কিয় বৈষম্য বেশ জানিতে পারা যায় যদি উভয়ে এক বিষয় অধিকার করিয়া ভাবিতে থাকে, তথাপি ভাব বৈচিত্র্যই ব্যক্ত হইয়া থাকে ব্যাসের শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলাকে এই জন্যই আমরা পৃথকরূপে দেখিতে পাই কবি যেরূপ এক বিষয়ের বর্ণনা করিতে যাইয়া তৎসম্বন্ধে আপনার স্বতন্ত্র ভাবের অভিব্যক্তি করেন, দার্শনিকও সেইরূপ একই বস্তুকে পৃথকভাবে বুঝাইয়া দেন এমন কি পিতা পুত্র ও পতি পত্নীর মধ্যেও মনোভাবের বৈষম্য দেখা যায়; শত চেষ্টা করিলেও এক মনকে অপর মনের সর্ব্বাঙ্গিনভাবে অনুরূপ করিয়া তুলিতে পারা যায় না এজন্যই "বিচিত্ররূপাঃ খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ"

মহাকবির উক্তি দেখিতে পাই কাজেই এইরূপ অবস্থাতে জীবকে এক বলিয়া ধারণা করা সহজ ব্যাপার নহে পক্ষান্তরে, এক ব্যক্তি যখন বিভিন্ন সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি করিতেছে, তখন কিপ্রকারে জীবের একত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে? আর নানাজীব প্রত্যক্ষ করিয়া যদি মানুষ একজীববাদের গরিমা লইয়াই আপনার জ্ঞানের বড়াই করিতে থাকে, তবে বিচারশীল ব্যক্তি তাহাকে জ্ঞানী বলিয়াই বা সম্মান করিবে কেন?

নানাজীববাদীর স্বপক্ষ সমর্থক এইরূপ বহু বিষয় থাকিলেও নানা জীব যে একই জীবের কল্পনাপ্রসূত স্বপ্নাবস্থা ভাবিয়া দেখিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় এই অবস্থাতে একই ব্যক্তি বিংশতি লক্ষ লোকের কুম্ভমেলা সৃজন করিয়া বসে সুতরাং জাগ্রৎ অবস্থার বিভিন্ন জীবগুলি যে একই জীবের কল্পিত নহে, ইহার কোন অব্যভিচারী প্রমাণ পাওয়া যায় না আর একব্যক্তি যে আপনার ইন্দ্রিয়বোধ বা মনোবোধ ব্যতিরেকে অপরব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারেনা, তাহা পূর্ব্বে বিবৃতরূপে ব্যক্ত হইয়াছে তবে মানুষ যে আপনার সাদৃশ্যে অপর জীব মানিয়া লইতে অভ্যস্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই যাহাহউক শুদ্ধচৈতন্য ব্যতীত ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি কল্পনা-বিজৃম্ভিত বলিয়াই সাব্যস্ত হয় কেননা ব্যক্তিত্বকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেও উহার মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধ ও মনোবোধ ছাড়া অপর কিছু পাওয়া যায় না যদিও প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়-বোধ ও মনোবোধ আছে বলিয়া বোধ হয়, তথাপি উহা যুক্তি প্রমাণ দ্বারা নিরূপণ করিতে পারা যায়না এই জন্য যে, নিখিল প্রতীয়মান বস্তুই প্রত্যেক ব্যক্তির স্বকীয় ঐ বোধযুগল বলিয়া যুক্তি প্রমাণ হইতে প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে যদু উপেনকে কেবল আপনার সাদৃশ্যে বিনা প্রমাণে স্বতন্ত্র বলিয়া মানিয়া লয়। যদি উপেন সম্বন্ধে যাহা কিছু

অনুভব করে উহা তাহার নিজের ইন্দ্রিয় বা মনোজনিত জ্ঞান না হইত, তবে উপেন যে যদু হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ইহা প্রমাণিত হইয়া পড়িত। কিন্তু নিবিষ্ট চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে এক ব্যক্তির আপনবোধ সম্পত্তিই অপর ব্যক্তিরূপে ধরা দেয়।

মায়ার কি অদ্ভুত শক্তি যে নানাজীব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না পাইয়াও মানুষ উহার সংস্কারকে ধুইয়া ফেলিতে পারে না। এক শুদ্ধ চৈতন্যকে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন পরিচ্ছদ পরাইয়া বহু করিয়া তুলিয়াছে ইহা ভাবিতে গেলে মায়াকে জনজননী না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। শাক্তগণ এজন্যই মহামায়াকে সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয় কারিণী বলিয়া জানেন। যাহা হউক, ব্যক্তিত্ব যে ইন্দ্রিয় বোধ বা মনো বোধের পরিণাম বিশেষ ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই কেন না সুষুপ্তিতে ইহার অভাব হইয়া থাকে। এই জগতে যে সুষুপ্তি অবস্থাতে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে এমন জীব অভাব গ্রস্তই বটে। সুষুপ্তিতে মায়া একই ভাবে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া কারণ অবস্থাতে উপনীত হয় এই জন্য ঐ অবস্থাতে তাহার ভিন্নতা কিছুমাত্র থাকে না। যদিও জাগ্রৎ অবস্থার লোক সুষুপ্ত জীবকেও বিভিন্নরূপে অনুভব করে তথাপি উহা তাহারই মনোবোধ বা ইন্দ্রিয়বোধ ব্যতিরেকে অপর জিনিষ নহে। কেননা ঐ লোক ইন্দ্রিয়বোধ ও মনোবোধের অতীত সুষুপ্তিতে আসিলে অপর সুষুপ্ত জীবের ন্যায় কেবল অন্ধকারই দেখিতে পায়। তবে ইহার সঙ্গে তাহার সুখানুভূতিও হইয়া থাকে, কেন না আমি সুখে শুইয়া ছিলাম কিছুই জানিতে পারি নাই, সুষুপ্তি ভঙ্গের অব্যবহিত পরক্ষণেই এইরূপ স্মৃতি হইতে দেখা যায়! ইহাতে যদি আপত্তি আসে যে ঐ স্মৃতিটা সুষুপ্তির অজ্ঞান ও সুখ অনুভূতির খবর না আনিয়া জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সন্ধিস্থলের ঐ সমাচার আনিয়া দেয় তথাপি এক অনুভব বিরোধী অনুভবের উদয় না হইলে ধারাবাহিক

রূপে হইতে দেখা যায় বলিয়া সুষুপ্তিভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞান ও সুখের অনুভব ধারাবাহিকই হয় ইহা বাধ্য হইয়া না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না।

এইরূপে সুষুপ্তি অবস্থাতে জীবের নানাত্ব সিদ্ধ না হওয়াতে বুক ফুলাইয়া বলিতে পারা যায় যে কার্য্য অবস্থাতে মনোবোধ ও ইন্দ্রিয়বোধের বৈচিত্রে জীব নানা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সুষুপ্তি জীবের কারণঅবস্থাগত একত্ব বুঝাইয়া দেয় আর জাগ্রৎ এবং স্বপ্নরূপ কার্য্যঅবস্থায়ও যে জীবের নানাত্ব যুক্তি প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না ইহাও ব্যক্ত হইয়াছে; কাজেই কোন্ বিচারশীল ব্যক্তি নানাজীব বাদের লীলা রসরঙ্গে মজিয়া থাকিতে পারে? তবে আমার পাঁঠা আমি লেজেই কাটিব এইরূপ হটকারিতার কথা স্বতন্ত্র। পক্ষান্তরে শুদ্ধ চৈতন্যের দিক দিয়া দেখিলে কোন অবস্থাতেই যে নানাত্বের লেশও জীবে প্রতিপন্ন হইতে পারে না, ইহা বুঝা যায়। কারণ কীটাণু হইতে সুবৃহৎ হস্তী পর্য্যন্ত সকল জীবেরই চৈতন্য একরূপ। রামের চৈতন্য সুন্দর আর শ্যামের চৈতন্য কুৎসিত, এইরূপ উক্তি বিকৃত বুদ্ধিরই পরিচায়ক। তবুও যাহারা মূলতঃ আত্মাকে নির্গুণ মানিয়াও তাহার নানাত্ব ঘোষণা করে তাহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ। যাহা হউক অন্ধবিশ্বাস যে অসম্ভবকেও সুসম্ভব করিতে পারে এবং ইহাই যে নানাজীববাদীর প্রধান সম্পত্তি তাহার কোন সন্দেহ নাই। কেননা মৃত্যুর পরেও যে জীবের স্বতন্ত্র সূক্ষ্মশরীর থাকে তাহা কেবল ইহার প্রসাদেই বুঝিতে পারা যায়। যদিও কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে জীবের তিন প্রকার শরীর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি মৃত্যুর পরে যে সকল বৃত্তান্ত সূক্ষ্মশরীর সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। ভূত প্রেতের কথাগুলির মূলে যে কি সত্য

আছে তাহা আজ পর্য্যন্তও নিরূপিত হয় নাই। কাজেই সূক্ষ্ম শরীরের দোহাই দিয়া যাহারা একজীবকে বহু বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলা যায় না। কেননা সুষুপ্তিতে যখন ইহার তিরোভাব হয়, তখন মহা-সুষুপ্তিরূপ মৃত্যুতেও যে ইহা বর্ত্তমান থাকে তাহাতে কিরূপে প্রত্যয়ান্বিত হইতে পারা যায়? বিদেহ-কৈবল্য পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম শরীরটা এক ভাবেই বর্ত্তমান থাকে এরূপ উক্তিও প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় না। কেননা স্থূলদেহের অবলম্বন ব্যতীত সূক্ষ্মদেহের কোন ক্রিয়াই যখন দেখিতে পাওয়া যায় না তখন উহার স্বতন্ত্রতা প্রতিপন্ন হয় কৈ? কাজেই যাহা সূক্ষ্মশরীর বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাকে স্থূল শরীরের ক্রিয়া বা অবস্থা বিশেষ বলাই যুক্তিসঙ্গত।

বন্ধন মুক্তির ব্যবস্থার জন্য জীবকে মূলতঃ নানা বলিয়া প্রকারান্তরে ভেদবাদের সমর্থন করা অপেক্ষা অন্তঃকরণ ও শরীরাদি উপাধিজনিত ঔপাধিক ভিন্নতা বলাই বিবেকানুমোদিত। আর যোগী যে কায়ব্যূহ অবস্থাতে একই জীবচৈতন্য দ্বারা সহস্র সহস্র শরীরের পৃথক পৃথক ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকেন ইহা ভেদবাদীও স্বীকার করে। সুতরাং জীবচৈতন্য মূলতঃ এক হইলেও উপাধিভেদে বন্ধন মুক্তির ব্যবস্থাতে কোন অন্তরায় ঘটে না। পক্ষান্তরে, বন্ধন মুক্তির ব্যবস্থা করিতে যাইয়া একবস্তুকে বহু করিয়া তুলাতে যে মহান্ অনর্থ হয় তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে নিত্য-মুক্ত জীবচৈতন্যের বন্ধন মুক্তি কল্পনা করাই নিতান্ত ভ্রান্তির কার্য্য। বিশেষদর্শী জীবচৈতন্যকে বন্ধন মুক্তির অতীত নিত্য একরস পরব্রহ্ম বলিয়াই জানেন। অবিশেষদর্শী ইহা জানিবে কি প্রকারে? যে পর্য্যন্ত অবিদ্যার চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহার বিশুদ্ধ জ্ঞানাভাব, সুতরাং বিশেষদর্শনের খবর সে কোথায় পাইবে? যদিও নিষ্ঠাবান জিজ্ঞাসু বিশেষদর্শনের কোন কোন সমাচার পান, তথাপি

এক এক করিয়া সকল খবর সংগ্রহ করিতে পারেন না। অবশ্যই অতত্ত্বজ্ঞানীও বুদ্ধির চাতুর্য্যে জ্ঞানী জগতের বহিরঙ্গের কথা পাড়িয়া অজ্ঞানী সমাজকে বিমোহিত করিতে পারে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী উহাকে অগণ্য জিনিষেই পরিণত করিয়া লয়। যাহা হউক, জীবের আসল স্বরূপ যে বন্ধন মুক্তির সংস্রবে কখন আসেনা, ইহা অদ্বৈতবাদীর সাধারণ মত। এমন অদ্বৈতবাদী নাই যিনি ঐ স্বরূপকে নিত্য মুক্ত বলিয়া না জানেন। যদিও এরূপ অদ্বৈতবাদীও দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি নানাজীববাদের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তথাপি সকলেই একবাক্যে জীবের আসল স্বরূপকে পরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, কেননা উহাই অদ্বৈতবাদের ভিত্তি। পক্ষান্তরে দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরের ন্যায় পরব্রহ্মকে জীবের স্বতন্ত্র নিয়ন্তা বলিলে তিনি যে সর্ব্বদা অপরোক্ষ এই সত্যেরই অপলাপ হইয়া থাকে। কেননা কেহ যে আপন আত্মাছাড়া অপর আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করিতে পারে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আর অদ্বৈতবাদে হস্তামলকের ন্যায় পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষ বলিয়াই দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অপেক্ষা বিজ্ঞ সমাজে তাহার অধিক সমাদর। কাজেই ব্রহ্মকে ব্যক্তি বিশেষ বলিয়া যাহারা জানে তাহারা তাঁহাকে অন্ধ বিশ্বাসের তিমিরাচ্ছন্ন বলিয়াই মনে করে। না করিবে কেন? যে জিনিষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের অতীত, তাহার অনুমানও অপ্রামাণ্য আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি পায় না। এই জন্যই নাস্তিক সম্প্রদায় ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বরকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। কিন্তু দ্বৈতবাদী যদি আপনাদের ঈশ্বরকে নাস্তিকের সমক্ষে প্রত্যক্ষ বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে কখনই উপহাসাস্পদ হইত না। নাস্তিকের আর যত দোষই থাকুকনা কেন, তাহারা প্রত্যক্ষ বিষয়ে কখনও সন্দেহ করে না। ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বরবাদীর কেবল বিশ্বাস কর বিশ্বাস কর রব শুনিয়া এবং তাহাদের নিকটে সন্তোষ-

জনক কোন প্রমাণ না পাইয়া অবশেষে তাহারা যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর নিরাকরণে (খণ্ডনে) প্রবৃত্ত হইয়াছে আর ইহাতেইবা কি সন্দেহ আছে যে, যাহার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাহাকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিরূপে বলপূর্ব্বক মানিয়া লইতে পারে ?

নানাজীববাদে বিভিন্ন অবিদ্যা স্বীকার করাতে গৌরব দোষ আসিয়া থাকে একজীববাদে যদিও মায়ার অনন্ত বিভিন্ন শক্তি মানিতে হয় তথাপি ধর্ম্মি কল্পনা অপেক্ষা ধর্ম্ম কল্পনা অন্যায্য নহে আর বিভিন্ন অনন্ত শক্তির দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া নানা অবিদ্যা স্বীকার করিলেও সহজ ব্যাপার নহে কাজেই সুষুপ্তিতে অবিদ্যাগত বিভিন্নতা ধরিতে পারা যায় না বলিয়া অবিদ্যা যে মূলতঃ একই জিনিষ ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে তবে যে বেদান্তে নানাজীববাদের কথা পাওয়া যায়, তাহার মূলে অজ্ঞানীর পরিতোষ নীতিই রহিয়াছে যাহাই হউক, একজীববাদ বেদান্তের সিদ্ধান্ত মত বলিয়াই প্রথিত হইয়া আসিতেছে। এবং ইহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে এরূপ নিষ্ঠাবান বৈদান্তিক বিরল পরন্তু কেবল উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র পড়িয়া এই রহস্যতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না এই জন্য প্রকরণ গ্রন্থও পড়া উচিত যে প্রকারেই হউক, একজীববাদের তত্ত্ব আমূলতঃ বুঝিয়া লইতে পারিলে সহজেই স্বজাতীয় ভেদের দায় হইতে সম্পূর্ণ রূপে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়

একজীববাদ ও নানাজীববাদে পার্থক্য এই যে, একজীববাদে চৈতন্য ও তাহার উপাধিভূত মায়া, উভয়ের একত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে ; কিন্তু নানাজীববাদে চৈতন্যকে এক মানিয়াও তাহার উপাধি অনন্ত অবিদ্যা স্বীকৃত হইতে দেখা যায় এই রূপে একজীববাদে ঈশ্বরোপাধি ও জীবোপাধি এক মায়াই সাব্যস্ত হইয়াছে কিন্তু নানাজীববাদে জীবও ঈশ্বরের উপাধি সম্বন্ধেও পার্থক্য দেখা যায় যাহা হউক, এই

মতদ্বয়ের মধ্যে কোনটাতেই উপাধিকে সত্য বলিয়া প্রথিত করা হয় নাই, কাজেই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে যদিও নানাজীববাদে অনন্তজীব ও জীব হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি উভয়ই মিথ্যা বলিয়া প্রথিত হওয়াতে, অদ্বৈত বাদের অঙ্গে কোন আঘাত লাগে নাই, সুতরাং একজীববাদী ও বহুজীববাদী উভয়েই যে ভেদবাদের কলঙ্কে লিপ্ত হন নাই ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে তবে একজীববাদই উৎকৃষ্ট পন্থা, কেননা ইহ হইতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে পৌছিবার পথ অতি সুগম একজীববাদে ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু মাত্রই প্রাতিভাসিক এইজন্য দীর্ঘকালের তরে কোন জিনিষের স্থায়ীভাব মনে আসে না কাজেই নানাজীববাদীর ব্যবহারিক সত্ত্বা খাড়া করিয়া মায়িক বস্তুকেও যেরূপ সাময়িক ভাবে স্থায়ী বলিয়া বিবেচনা করিবার আশঙ্কা আছে, একজীববাদীর পক্ষে সেরূপ নাই মায়িক বস্তু মাত্রই প্রতীতি কাল মাত্র স্থায়ী, একজীববাদী ইহাই অনুভব করিয়া থাকেন, এবং অপরাপর জীবকে আপনারই কল্পনা-প্রসূত বলিয়া অনুভব হওয়াতে অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মাকে অনায়াসে ধরিয়া লইতে পারেন। যদিও একজীববাদী নানাজীববাদীর ন্যায় বিভিন্ন শরীরাদির প্রতীতি হইতে অব্যাহতি পান না বটে, কিন্তু উহা যে নিজের মনোবোধ ও ইন্দ্রিয়বোধ ইহাতে কখনও তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হয় না।

পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান

সাদা কথায় বলিতে গেলে যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শাব্দ ও অনুমিতি প্রভৃতি, তাহাই পরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ যদিও পরোক্ষ জ্ঞানের পরম্পরা কারণরূপে অপরোক্ষ জ্ঞানের কারণকেও

ধরিয়া লইতে পারা যায়, তথাপি পরোক্ষ জ্ঞান ঐ কারণের দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে জনিত নহে, এইজন্য উহাতে অপরোক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ সামঞ্জস্য হয় না। পরোক্ষ জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞেয়বস্তু সম্বন্ধে নিখিল সন্দেহ দূর করিয়া দিতে পারে না। এইজন্য কেবল উহা হইতেই মানুষের মনে বস্তুগত দৃঢ় প্রত্যয় হয় না। কাজেই অপরোক্ষ জ্ঞানের ব্রহ্ম যেরূপ অধিকারীকে শান্তি ও অভয় পদে লইয়া আসে, পরোক্ষ জ্ঞানে সেরূপ আশা করা যায় না। তবে ইহা সত্য যে, ব্রহ্মের দৃঢ় পরোক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াও মায়িক বস্তুর সত্যত্ব বিপর্য্যাস হইতে অধিকারী অব্যাহতি পায়। পরোক্ষ জ্ঞান শাব্দ, অনুমিতি, অর্থাপত্তি, ও অনুপলব্ধি-ভেদে বেদান্তমতে পাঁচ প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি ইহার বিষয় অপরোক্ষ জ্ঞানেরও গোচর হইয়া থাকে, তথাপি সকল বিষয়কে যে ইহা ধরিয়া লইতে পারে না, তাহা অতীব সত্য ; কেননা এমন সূক্ষ্ম বিষয়ও আছে যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত।

সময়ে সময়ে পরোক্ষ জ্ঞানও যে অপরোক্ষের আকারে ধরা দেয় তাহার উদাহরণও পাওয়া যায়। যদিও এই ধরা দেওয়াটা ভ্রান্তির অন্তঃপাতী তথাপি অবিশেষদর্শী ইহাকে যথার্থ বলিয়াই ধারণা করিয়া লয়। এমন কি এরূপ বেদান্তীও আছে যে ব্রহ্মদর্শন না করিয়াও আপনাকে ব্রহ্মদর্শী মনে করিয়া থাকে। কিন্তু পরীক্ষাতে ইহাদের মলিন মুখ দর্শন করিয়া প্রকৃতই দুঃখ হয়। বিশেষদর্শীর নিকট অজ্ঞানী জ্ঞানীর পরিচ্ছদ পরিধান করিলেই জ্ঞানীর উচ্চাসনে স্থান পাইতে পারে না, কেননা তিনি সমস্তই বুঝিতে পারেন। তবে যে ব্যক্তি বাক্‌চাতুর্য্যে এবং লিপিচাতুর্য্যে মনোরঞ্জন করিতে পারে অজ্ঞানীর দল তাহাকেই জ্ঞানীর আসন প্রদান করে। যাহা হউক পরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বুঝিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। এই জন্যই সময়ে সময়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিও বাচনিক

জ্ঞানীকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া মনে করেন পরোক্ষ জ্ঞান অপরোক্ষের আকারে ধরা দিলেও উহা হইতে মানুষ বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব "ইদমেব" করিয়া বুঝিয়া লইতে পারে না সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে বাচনিক জ্ঞানী বস্তুর অন্তরঙ্গ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যাহা ব্যক্ত করিয়া থাকেন, জিজ্ঞাসু তাহাতে সন্তোষ লাভ করিতে পারে না তাহার ব্যাখ্যাত প্রত্যেক বিষয়ই বিশেষদর্শীর নিকট বহিরঙ্গ হইয়া দাঁড়ায় যদিও এইরূপ লোককে বহিরঙ্গ বিষয় নূতন ও মনোমোহন বেশে সুসজ্জিত করিতে দেখা যায় তথাপি তাহার ব্যাখ্যাত কোন বিষয়ই মানুষকে প্রকৃত বস্তুতত্ত্বের দিকে লইয়া যাইতে পারে না। তাহার রচিত বিষয় পাঠ করিয়া পাঠককে আনুষঙ্গিক অনাত্মচর্চ্চারই উন্নতি সাধন করিতে দেখা যায় যিনি স্বয়ংই প্রকৃত তত্ত্বের পরিজ্ঞান লাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন, তিনি যে ঐ সম্বন্ধে আপন ব্যাখ্যা দ্বারা বিচারশীল ব্যক্তির সন্তোষ জন্মাইতে পারিবেন ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? তবে ইহা সত্য যে আপাতদর্শী কিম্বা অসম্যক্ শিক্ষিতের দল তাহাকেও বিশেষদর্শীর পরিচ্ছদ পরাইয়া থাকে।

পরোক্ষ জ্ঞানের আবশ্যকতা থাকিলেও কেবল উহা দ্বারা মানব-মনের জ্ঞানপিপাসা মিটে না এইজন্য কেহ উহা লাভ করিলেও অপরোক্ষ জ্ঞানের লালসার নিবৃত্তি হয় না কাজেই অনুমান খণ্ডের খুটিনাটি লইয়া আজীবন ব্যতিব্যস্ত বা লিপ্ত থাকিয়াও মূল বস্তুর অদর্শন জনিত অশান্তি ভোগ করিতে অনেক ভেদবাদীকে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্যই তাঁহারা কথার তর্ক লইয়া অভেদবাদীকে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারেন, কিন্তু আপন মনের ঐ অশান্তি দূর করিবার জন্য কোন সাধনই খুঁজিয়া পান না জগতে কথার তর্ক যদিও অনাবশ্যক নহে, তথাপি উহাতে অতি মাত্রায় লিপ্ত হওয়া অকর্ত্তব্য, কারণ তাহা হইলে মূল উদ্দেশ্য ও তৎসাধনোপায় হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতে

হইবে, এই জন্যই বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় ঐ তর্কের তত সমাদর করেন না না করুন, কিন্তু বস্তু নিরূপণের নিমিত্ত যোগ্যভাবে যে তর্কেরও প্রয়োজন, ইহা অস্বীকার করা যায় না কেননা তর্কই বিচারের অঙ্গ, আর বিচারের দ্বারাই বস্তু সিদ্ধি হয়, সুতরাং তর্ক পরিত্যাগ করিলে বিচারের অভাবে বস্তু সিদ্ধিই ঘটিয়া উঠিবে না তবে মূল বিষয়টী ছাড়িয়া অনুপযোগী অবাস্তব বিষয়ে জটিল তর্কের অবতারণা করা শ্লাঘনীয় নহে আর ইদানীন্তন সময়ে পৃথিবীতে কথায় তর্কের দানসাগর করিতে অতি অল্প লোকেই ইচ্ছা করে; যদিও কোন সময়ে পৃথিবীতে ইহারও আবশ্যকতা ছিল, তথাপি বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের সময়ে ইহা লইয়া মাথা ঘামাইতে যাওয়া সুবিবেচনার কার্য্য নহে

তর্ক বস্তু সিদ্ধির সাধন, সুতরাং ইহার মোহে পড়িয়া সাধনীয় বস্তুকে ভুলিয়া যাওয়া অন্যায় কিন্তু ইহাও সত্য যে সাধ্য বস্তুর অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত ইহাকে অবলম্বন করিয়াই চলিতে হইবে কেননা তর্ক ব্যতিরেকে এমন কোন অস্ত্র নাই যদ্দ্বারা অবস্তুর বন্য কুসুম লতাজাল ছেদন করিয়া লক্ষ্যাভিমুখী মার্গ পরিস্কৃত করা যাইতে পারে অপিচ তর্ককে উপেক্ষা করিলে মানব মন কেবল অন্ধ বিশ্বাসের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া পড়িবে আর অন্ধ বিশ্বাস মানুষকে যে অজ্ঞাতসারে অমানুষ করিয়া তুলে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যাইবে কেন?. ইহা ক্রমনীতিতে মানুষের ইতরভেদক প্রধান গুণ বিচার শক্তিকেই সঙ্কোচিত করিয়া ফেলে, এইজন্য গোড়ামি আসিয়া তাহার মনে আসন জমাইয়া বসে যদিও ইহা হইতে কোন না কোন বিষয়ে তাহার লাভ হইয়া থাকে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু মোটের উপর হিসাব করিয়া দেখিলে অলাভই দেখা যায় সুতরাং তর্ককে কিছুতেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে না যে সমাজে

ইহার অনাদর অধিক, সেই সমাজেই অবৈধকে বৈধত্বের ছদ্মবেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বিসম্বাদী ঘটনার কারণ এই যে তর্ককে বিদায় করিয়া দিলে মানুষ অন্যায্যকে ন্যায্য বলিয়া ধরিয়া লয়। অবশ্যই নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট ভ্রান্তি অধিষ্ঠানের পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের মনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লইয়া আসে, তথাপি ভ্রান্তির সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে অসার ও অহিত আনয়নকারীই বলিতে হইবে

মায়িক পদার্থের অপরোক্ষ জ্ঞানের ন্যায় পরব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান নহে কেননা প্রথমের ঐ জ্ঞান সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিলে ইহা বুঝা যায় যে, প্রতীয়মান জিনিষ মনের পরিণাম বিশেষ, এবং উহাকে স্বয়ং প্রকাশ নিত্যজ্ঞান প্রকাশ করে, কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানরূপ হওয়াতে উঁহার অপর কোন প্রকাশক নাই এইজন্য কেবল আবরণ বিধ্বংশের জন্য মনের ব্রহ্মাকার পরিণাম হইলেই স্বতঃ প্রকাশ ব্রহ্ম আপনা আপনি প্রকাশিত হইয়া পড়েন অর্থাৎ যখন মনের বিষয়াকার পরিণাম না হইয়া স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানরূপ ব্রহ্মে উহা একাকার হইয়া যায় তখন ব্রহ্মাত্মা অপরোক্ষ জ্ঞানের গোচর বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকেন সুতরাং বুঝা গেল যে পরব্রহ্মে মনের লয়কেই ব্রহ্ম দর্শন বলা হইয়া থাকে জ্ঞানী মাত্রেরই যদিও এইরূপ লয় অন্ততঃ অল্প সময়ের জন্য হইয়া থাকে, তথাপি উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী না হওয়াতে উহাকে সমাধি বলা যায় না ধারাবাহিকরূপে ব্রহ্মাকার বৃত্তি হইবার পর ঐ বৃত্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভুলিয়া গেলে সমাধির আবির্ভাব হয়

ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ হইলেও মনের তদাকার পরিণাম বা বৃত্তিই ব্রহ্মদর্শনের অর্থ মনের পরিণামও যখন মায়িক ব্যাপারের অন্তঃপাতী, তখন ব্রহ্মদর্শন যে মায়ার চতুঃসীমার বাহিরে এরূপ বলা যায় না। যদিও বিজ্ঞ সমাজে ব্রহ্মদর্শন বিদ্যা বলিয়াই বিখ্যাত তথাপি যুক্তি ও জ্ঞানীর অনুভব বিদ্যাকে অবিদ্যা-কঞ্চুক-নির্ম্মুক্ত মায়ার অভিনব

আক্কাতিশ বুঝাইয়া দেয় তবে ইহা সত্য যে বিদ্যা অবিদ্যাকে ধ্বংশ মুখে নিপাতিত করিয়া দেয় ; কেননা ব্রহ্মাকার বৃত্তির উদয়ের সময়ে বিষয়াকার বিরোধী বৃত্তি আত্মলাভ করিতে পারে না আর কৃতবিদ্য সমাজ বৃত্তিদ্বয়ের অযোগপদ্যই স্বীকার করিয়া থাকেন যেমন কতক রেণু জলের মালিন্য বিনষ্ট করিয়া স্বয়ংও অবিনষ্ট থাকে না, সেইরূপ বিদ্যা অবিদ্যার বিধ্বংশ করিয়া নিজেও মৃত্যুর কবলে পড়ে এইরূপ উক্তিও শুনিতে পাওয়া যায়, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরেও সপ্তম ভূমিকায় উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত যে জ্ঞানীর বিষয়াকার বৃত্তি হয় ইহাকে অসত্য বলা যাইতে পারে না পরন্তু ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর ত্রৈকালিক অভাব প্রতীতিরূপ বাধকে তত্ত্বজ্ঞানের পরবর্ত্তী অজ্ঞান বিনাশের তাৎপর্য্য বলিলে সকল গোলযোগ চুকিয়া যায় কেননা এইরূপ বাধ জ্ঞানী মাত্রেরই দেখিতে পাওয়া যায়

ভ্রমপ্রমা ভেদে পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ জ্ঞানকে চারি প্রকারের বলা যাইতে পারে অর্থাৎ পরোক্ষ ভ্রম, পরোক্ষ প্রম এবং অপরোক্ষ ভ্রম ও অপরোক্ষ প্রম যদিও অপরোক্ষ প্রমা বস্তুগত সন্দেহ দূর করিয়া দেয়, তথাপি উহা উপেক্ষাত্মক হইলে বস্তুর সবিশেষ খবর আনিয়া মনে তৎসম্বন্ধে সংস্কার উৎপাদন করিতে পারে না কাজেই অনুপেক্ষাত্মক ঐ প্রমা জ্ঞানলাভ করিবার জন্য জিজ্ঞাসুর পক্ষে সতর্ক থাকা উচিত অনেকে যে ব্রহ্মাত্মার অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াও তাঁহাকে ভুলিয়া যান, তাহার মূলে ঐরূপ বিভ্রাটই ধরা দেয় চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া বস্তুর অনুভব না করিলে যে উহার স্মৃতিতে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহার উদাহরণ সচরাচর পাওয়া যায় আর অনিবিষ্ট-ভাবে পদার্থানুভবই উপেক্ষা জ্ঞানের বিবরণ, সুতরাং বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানকে সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসুকে সাবধান হইতেই হইবে

পরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থে আছে, কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে উহা যে সন্তোষজনক হইবে এরূপ আশা করা যায় না কারণ উহাতে কথার তর্কই অধিক কাজেই যাহা ব্রহ্ম দর্শনের অব্যভিচারী সাধন-পরম্পরার অন্তর্নিবিষ্ট তাহাই পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করা যাইতেছে আর উক্ত বিষয়ের সম্যক্ পরিজ্ঞান, সংস্কৃত গ্রন্থের আলোচনা ব্যতীত হইবার নহে যাহা হউক, পরব্রহ্মের অনুপেক্ষাত্মক অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে অধিকারী পরমপদে উপনীত হয়, এইজন্য পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের সহিত পরিচয় করিতেই হইবে। আর যাঁহারা ইংরাজিতে বা অপর কোন ভাষাতে বেদান্তের অনুবাদ পড়িয়া থাকেন এবং বেদান্তকে পাশ্চাত্য ভাবের অঞ্জন লাগাইয়া দেখেন, তাঁহাদের মধ্যে তত্ত্বদর্শী কমই দেখিতে পাওয়া যায় তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে, অপ্রবুদ্ধ সমাজের মনোরঞ্জনকারী বাক্‌চাতুর্য্য ও রচনানৈপুণ্য তাঁহারা সন্তোষজনক ভাবে অর্জ্জন করেন, তাহা অতীব সত্য কিন্তু তাঁহাদের অভিভাষণ ও রচনাতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রকৃত তত্ত্বের কথা প্রায়ই থাকে না এবং তাঁহাদের সঙ্গ করিয়া কে যে ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছে আজ পর্য্যন্তও তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কেবল কথার পাণ্ডিত্যে যে মনে শান্তি আসে না তাহাতেই বা কি সন্দেহ আছে? কাজেই যথার্থ জ্ঞানী যদি প্রচলিত পাশ্চাত্য ভাবের ব্যবহারে বা অঙ্গ ভঙ্গীতে অনভিজ্ঞও থাকেন, তথাপি তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া চলা জিজ্ঞাসুর কর্ত্তব্য কেননা এক ব্রহ্মতত্ত্বের পরিজ্ঞান হইলে মানুষের জ্ঞাতব্য আর কিছু থাকে না ইহার ভাবার্থ এই যে প্রত্যেক জ্ঞাতব্য জিনিষের আসল স্বরূপই পরব্রহ্ম এইজন্য রূপের বাজার ও গুণের বাগানগুলি প্রতীয়মান হইলেও অসার বলিয়াই

নির্দ্ধারিত হয়। আর অনাত্মবস্তুর মোহে পড়া যে মূঢ়তার পরিচায়ক ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত অবশ্যই পাশ্চাত্যভাব যদি পরম পদের কারণ হইত, তবে উহাতে অভিজ্ঞতা লাভের ইচ্ছা বিশেষদর্শীর মনও আকৃষ্ট করিত, কিন্তু দেখিতেছি বিপরীত; ইহা পরম পদে লইয়া যাইবার পরিবর্ত্তে, মানুষকে অমানুষিক ভাবের দিকেই পরিচালনা করিতেছে

নিরন্তর ব্রহ্মাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিলে, মায়িক বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানীর কেবল উপেক্ষা জ্ঞান হইতে থাকে; এবং এই উপেক্ষা জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়ের স্মৃতি লইয়া আসে না বলিয়া অনাত্ম চিন্তার বিভ্রাটে পড়িয়া তাহাকে অবসন্ন হইতে হয় না অবশ্যই উপেক্ষাত্মক প্রত্যক্ষও মায়িক জিনিষকে সম্মুখে খাড়া করিয়া দেয়, কিন্তু ইহা দ্বারা ঐ জিনিষের আসক্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কেননা বারম্বার কোন বস্তুর স্মৃতি না হইলে মানুষ তাহাতে আসক্ত হইতে পারে না সুতরাং বুঝিতে পারা গেল যে, ব্রহ্মাভ্যাস ক্রমনীতিতে অনাত্ম-বস্তুর অনুপেক্ষা জ্ঞান মিটাইয়া তাহার চিন্তাজনিত অবসাদ হইতে মানুষকে পরিত্রাণ করিয়া দেয় পরন্তু এইস্থলে ইহাও আবশ্যকরূপে বিবেচ্য যে, একমাত্র মায়িক জিনিষের অনুপেক্ষা জ্ঞানেই লোক কৃতার্থ হইতে পারে না এই জন্য যে, বিবেকীর বিচারে ব্রহ্মাত্মার দৃঢ় অনুপেক্ষা প্রত্যক্ষই জ্ঞানীকে অভয় পদে আনিয়া থাকে ইহা সাব্যস্ত হয় অতএব ঐ পদের প্রার্থীকে এক সঙ্গে মায়িক বস্তুর উপেক্ষা জ্ঞান ও ব্রহ্মাত্মার অনুপেক্ষাত্মক অপরোক্ষ জ্ঞানের অভ্যাস করিতে হইবে যদিও এই অভ্যাস হারমোনিয়াম বাজাইবার ন্যায় সহজ নহে, তথাপি যথাযথ অধ্যবসায়ের প্রভাবে মানুষ ইহাতেও কৃতকার্য্য হইয়া থাকে এমন জ্ঞানীও বিরল নহেন যিনি পূর্ব্বানুভূত বস্তু সম্বন্ধে পরে খবর রাখেন না এক সঙ্গে উক্ত জ্ঞান যুগলের অভ্যাস করিবার সময়েই, অধিকারীর মনে এমন লোকোত্তর

শান্তি আসে, যাহা বিষযাসক্ত ব্যক্তি কদাচিৎ স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারে না বিশেষতঃ গৃহমেধী জ্ঞানীর পক্ষে এই অভ্যাস অতুলনীয হিত লইয়া আসে, কেননা তিনি বীতরাগ যতির ন্যায নির্জ্জনে বসিযা কেবল অনাহত ধ্বনির সাক্ষী ব্রহ্মাত্মারই ধারাবাহিকরূপে অনুভব করিয়া থাকেন যদিও গৃহস্থ জ্ঞানীর পক্ষে মায়িক বস্তুর ব্যবহার উপেক্ষাতে অনেক অন্তরায ঘটিযা থাকে তথাপি এই অভ্যাসে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, উহা হইতে অশান্তি আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না আর যখন ব্রহ্মবিস্মৃতি বা ব্রহ্মের অজ্ঞান, অবসাদের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইযাছে তখন যিনি বস্তু উপলব্ধি সময়েই ব্রহ্মাত্মার প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহার মনে কি প্রকারে অশান্তি আসিতে পারে? সুতরাং অধিকারীর উচিত যে তিনি যেন সর্ব্বদা চিদাত্ম স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য সতর্ক থাকেন

আসল ও নকল জীব

সাধারণ লোক নকল জীবেরই অনুরাগী। তাহারা আসল জীবের জটিল তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইতে চাহে না যদিও এই শ্রেণীর মধ্যে "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ" নীতির লোকও আছে,—তথাপি সকলেই এইরূপ নহে কেন না ঈশ্বর, তাহার উপাসনা প্রভৃতি সাধন ও পরকাল মানে এমন ব্যক্তি ও এই শ্রেণীরই অন্তঃপাতী। তবে ইহা সত্য যে পাপ, পুণ্য স্বর্গ ও নরক প্রভৃতির ভাব, এইরূপ ব্যক্তি আত্মার উপরেই চাপাইযা থাকে আত্মা যে স্বভাবতঃ নির্ম্মল ও নির্লেপ, ইহা কোন প্রকারেই তাহাদের বিশ্বাসে আসে না যাহা হউক, এই শ্রেণীর মধ্যে এমন লোক বিরল বলিলেই চলে যে, সুখে, দুঃখে, শোকে এবং

হর্ষে এক ভাবাপন্ন থাকিতে এবং নিজের তুলনায় অপরের সহিত সর্ব্ব বিষয়ে সমব্যবহার করিতে পারে কাজেই জ্ঞানীর সহিত কোন বিষয়ে এই শ্রেণীর তুলনা করিতে পারা যায় না। যিনি উদারভাব সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হন, এমন লোক ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাইলে ও নিবিষ্ট চিত্তে বিবেচনা করিলেই উহার মূলে কোন অনুদার ভাবই ব্যক্ত হইয়া পড়বে কিন্তু জ্ঞানীর উদার ব্যবহারের প্রত্যেক অঙ্গ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও লোকসংরক্ষণ ব্যতীরেকে অপর কোন প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন অমানুষিক ভাব কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে না বিশেষতঃ জাঁকজমকে, বাহ্য আড়ম্বরে বা উদ্দেশ্য গোপনে জ্ঞানী যখন অভ্যস্ত নহেন, তখন তদীয় কার্য্যাবলির পরীক্ষাতে ও সবিশেষ আয়াস পাইতে হয় না তবে ইহা সত্য যে, বর্ত্তমান সভ্যতার দিক দিয়া দেখিলে যাহার অনুষ্ঠিত বিষয় সহজেই পরীক্ষিত হইয়া যায়, সেই ব্যক্তি কখনও বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসা লাভ করিতে পারে না , কিন্তু আর্য সভ্যতাতে বালকের ন্যায় সরল হওয়া প্রজ্ঞাপারগামী তত্ত্বদর্শীর লক্ষণ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে

সকল জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিলে স্থায়ী ভাবাপন্ন কিছুই অনুসন্ধানে আসেনা, কেবল ক্ষণ ভঙ্গুর বিবিধ প্রকারের মনোবোধ ও ইন্দ্রিয় বোধই ধরা দেয় এই উভয় বোধের সমষ্টিই সকল জীবের প্রবৃত্তি-নিমিত্ত স্বরূপে বিচারে সাব্যস্ত হয় যদি ও প্রত্যেক বোধের সম্বন্ধেই ত্রিপুটীভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি বোধ ব্যতীত বোদ্ধা ও বোধ্যের স্বতন্ত্র কোন সত্তা ধরিয়া লইতে পারা যায় না মনে করা যাক্ যে, আমি পুস্তক দেখিতেছি, কিন্তু আমি, পুস্তক ও দেখাকে পৃথক্ ভাবে বুঝিয়া লইতে পারা যায় না ; কারণ জ্ঞান ব্যতীত দ্বিতীয় স্থায়ী বস্তু বিচারে সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং আমি পুস্তক ও দেখা, পৃথক্ সত্তাশালী বলিয়া নিরূপিত হয় না তবে দেহাত্ম-ভ্রান্তি এবং

বস্তু জ্ঞানের বারম্বার আবৃত্তি-জনিত-ভ্রান্তিতে পড়িয়া মানুষ যে এই প্রকার ত্রিপুটিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে ইহা অতীব সত্য যা'হ' হউক, যেরূপ মনোবোধ বা ইন্দ্রিয়বোধ ছাড়া জ্ঞেয় বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না, সেইরূপ উহা ব্যতীত স্বতন্ত্র আমি ও অনুসন্ধানে আসেনা কেবল অবিদ্যার ষড়যন্ত্রে পড়িয়া মানুষ স্বতন্ত্র জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার বৃথা কল্পনা করে মাত্র বাস্তবিক পক্ষে যাহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহারই তরে মানুষ কি নাকরিয়া থাকে যদ্যপি যে আমি বাল্যকালে পুতুল লইয়া খেলা করিতাম, আজ বার্দ্ধক্যে সেই আমিই জড়সর হইয়া পড়িয়াছি, এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞান লোকের হইয়া থাকে, তথাপি বিচারে ইহা অপ্রমা-মূলক বলিয়াই সাব্যস্ত হয় মানুষ তুল্যভাবে দৈহিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া এক স্থায়ী আমির অস্তিত্ব বিনা প্রমাণে মানিয়া লয় যাহা এই আছে এই নাই নীতিতে প্রবাহের বারির মত, অবোধ লোক তাহাকেই স্থায়ীভাবের অলঙ্কারে সুসজ্জিত করে। এইরূপ মোহ বিধ্বংশের উপায় তত্ত্বদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় নকল জীবের একাধিপত্য কেননা উভয় অবস্থাতেই মনের বিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে। কিন্তু সুষুপ্তিতে মনের বিলয়ে উহার কোন প্রভুত্ব থাকেনা এইজন্য যে, সুখ ও অজ্ঞান অনুভূতি ব্যতিরেকে অপর জিনিষের প্রতীতি এই অবস্থায় হয় না বিশেষতঃ ঐ অবস্থাতে বহুরূপীর সং ছাড়িয়া এক অভিন্ন রূপে উহা নীরবে অবস্থিতি করে যদ্যপি জাগ্রৎ অবস্থার লোক সুষুপ্তির রাম শ্যাম ও যদুকে পৃথক ভাবে দেখিয়া থাকে, তথাপি রাম প্রভৃতি সুখ ও অজ্ঞান ব্যতীত কিছুই জানে না প্রকৃত পক্ষে সুষুপ্তি অবস্থাতে জীবের নকল ভাব সর্ব্বথা তিরোহিত না হইলে ও নানাত্বের বন্ধন হইতে উহা অব্যাহতি পায়, কারণ নিখিল প্রাণীরই সুষুপ্তি এক প্রকারের আর

যখন জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার ন্যায় ঐ অবস্থার কোন পার্থক্য ধরিয়া লইতে পারা যায়না তখন ঐ অবস্থাপন্ন জীবকে নানা স্বীকার করাতে অবিবেচকের কার্য্য না হইয়া থাকে না যাহা হউক, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থাতে যে নকল জীব হুলুস্থূলু ব্যাপার করিয়া তুলে তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই এমন অজ্ঞানী বিরল বলিলেই চলে, যিনি ঐ অবস্থা যুগলে আসিয়া আপনাকে সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব মোহে নির্লিপ্ত রাখিতে পারেন তবে কথার বিদ্যাবাগীশ অনেক পাওয়া যায় কিন্তু ইঁহারা ব্যবহার বিশেষে আত্মপরিচয় না দিয়া থাকিতে পারেন না কাজেই আসল জীবের তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁজিয়া লইতে না পারিলে নকল জীবকে শান্তিসুখে বঞ্চিতই থাকিয়া যাইতে হয় যদ্যপি নকলজীব অবিরত অবিদ্যার বশে থাকে, তথাপি আসল জীবকে বুঝিয়া লইতে পারিলে উহা যে অসার, স্বতঃসত্তা শূন্য ও আসল জীবের আশ্রিত ইহা ব্যক্ত হইয়া পড়ে তত্ত্বজ্ঞানের পরে ও সপ্তম ভূমিকায় উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত নকল জীবের লীলা খেলা একবারে বন্ধ হয় না সুতরাং বুঝিতে পারা গেল যে, নির্ব্বিকল্প সমাধি বা মৃত্যুতেই নকল জীবের তিরোভাব হয় কিন্তু চিরসমাধি ও মৃত্যুর তিরোভাবটা পুনরাবির্ভাব রহিত এবং সাময়িক সমাধির পরে ব্যুত্থান হইতে দেখা যায় বলিয়া উহাকে ঐ প্রকার বলা যায় না নকল জীবকে এইরূপে ব্যক্তি জীবও বলা যাইতে পারে, কেননা নকল জীবের তিরোভাবে ব্যক্তিত্ব ও বিলুপ্ত হয়। যদ্যপি সুষুপ্তি এবং সাময়িক সমাধিতে ও ব্যক্তিত্বের ইতর ভেদক কোন নিদর্শন থাকে না তথাপি পুনরাবির্ভূত হইতে দেখা যায় এইজন্য ঐ অবস্থাদ্বয়ে উহার লয় হইয়া থাকে এইরূপ বলাই যুক্তি সঙ্গত

নকল জীবকে মায়া বিশিষ্ট জীব বলিয়া শাস্ত্রে বলা হইয়াছে এইজন্য যে, ইহা মায়াতে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। মায়াবিশিষ্ট জীব

সর্ব্বদা অপ্রবুদ্ধ অবস্থাতে মায়া লইয়াই লীলা খেলা করে। যখন তাহার তত্ত্বদর্শন হইয়া যায় তখন সেই জীব বুঝিতে পারে যে, আসল জীব নিরন্তর মায়াতে নির্লিপ্ত রহিয়াছে যদ্যপি আসল জীবকেই ভ্রান্তির মোহে পড়িয়া মানুষ নকল করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি তত্ত্ব জ্ঞান না হইলে ইহা বুদ্ধির অগম্যই থাকিয়া যায় কেননা অধিষ্ঠানের জ্ঞান না হইলে ঐ মোহ কিছুতেই অপনোদিত হইবার নহে আর নিখিল ভ্রান্তির অধিষ্ঠানের অপরোক্ষ জ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান সুতরাং বুঝিতে পারা গেল যে নকল জীবের গৌরব বিশেষ দর্শনের অভাবের উপর নির্ভর করে অবিশেষদর্শীই নকল জীবকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া অবিদ্যার গন্ধর্ব্বনগর দেখিয়া থাকে যদ্যপি বিশেষদর্শীকেও এই নগর দর্শন করিতে দেখা যায় তথাপি তিনি উহাকে সত্য বলিয়া মনে করেন না কেননা তাহার এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, প্রতীতির পূর্ব্বে বা পরে উহা থাকে না

নকল জীবের কথা শেষ করিয়া এইক্ষণে আসল জীবের আলোচনা করা যাউক আসল জীবকে পণ্ডিতের ভাষায় কুটস্থ বা সাক্ষী চৈতন্য বলা যায় যদ্যপি ইহাও মায়া সম্পর্ক শূন্য নহে, তথাপি ইহাকে তাহার বন্ধনে আসিতে দেখা যায় না ইহা নিরন্তর মায়িক ব্যাপারে তটস্থ থাকিয়া মায়াকে আপন আশ্রয়ে রাখিয়াছে মায়া বিভিন্ন প্রকারের পরিণাম খেলা খেলিতেছে সত্য কিন্তু সাক্ষী চৈতন্য কখনও পরিণত বা বিকৃত হইতেছে না যদ্যপি মায়িক বস্তুর ব্যবসায় জ্ঞানে জ্ঞেয় বস্তু হইতে স্বতন্ত্ররূপে স্বয়ং প্রকাশ সাক্ষী চৈতন্যকে ধরিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে, তথাপি ঐ বস্তুরই অনুব্যবসায় জ্ঞানে বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে উহা অপ্রকাশিত থাকেনা। তিনি বুঝিতে পারেন যে, বস্তুর প্রকাশরূপ জ্ঞান বস্তুরূপ নহে উহা হইতে স্বতন্ত্র, কেননা বস্তুর অভাবের ও প্রকাশ হইয়া থাকে। আর প্রকাশকে অভাবরূপ বলিলে উহা

অবস্থাতেই পরিণত হইয়া পড়ে এইরূপে কোন বস্তর অভাব জ্ঞানের সম্বন্ধে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখিলে বস্তুর প্রকাশরূপ জ্ঞান যে তাহা হইতে স্বতন্ত্র জিনিষ এই সত্য ব্যক্ত না হইয়া থাকে না তবে ইহা এইরূপে ভাবিয়া দেখিতে পারে এরূপ লোক বসুন্ধরাতে অভাব না হইলেও অল্পই বটে কেননা অবিদ্যা বস্তর মোহনরূপ ধরিয়া অপ্রবুদ্ধ লোকদিগকে যখন বিমোহিত করিয়া ফেলে তখন তাহারা মাত্রা স্পর্শের প্রলোভনে পড়িয়া যেরূপ তাহাকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া লয় সেইরূপ সুখ দুঃখ প্রভৃতি আন্তরিক ভাবের সম্বন্ধে ও দেখিতে পাওয়া যায় কাজেই ভাবরতি ও মাত্রা স্পর্শ রতিরই অজ্ঞানী সমাজে অধিক প্রভুত্ব এমনকি এই অনুরাগ তাহাদের হৃদয়ে এরূপ ভাবে বদ্ধমূল হয় যে, উভয়ের পরে আর কোন জিনিষ আছে কিনা এই অনুসন্ধানে স্বতঃই তাহারা বিতৃষ্ণ হইয়া উঠে এবং এই বিতৃষ্ণা পরিণত হইয় উঠিলেই ক্রমনীতিতে মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া পার্থিব ভাবের দাস হইয়া পড়ে।

আসল জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন জিনিষ কেবল অজ্ঞানের কুহকে পড়িয়া মানুষ ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না অজ্ঞান আচ্ছন্ন লোক মনে করে যে, পাপলিপ্ত জীবকে ব্রহ্ম মনে করা অসামান্য অপরাধ নহে আবার এই প্রকার অজ্ঞানীও চক্ষুর অতিথি হইয়া থাকে যে এই প্রকারের মনে করাকে বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণেই পরিণত করিয়া লয় যাহাই হউক, ব্রহ্ম যদি জীব হইতে স্বতন্ত্র জিনিষই হইত তবে জীবের কোন মূল্যই থাকিতনা কেননা তদতিরিক্ত বস্তু মাত্রই প্রতীতিকালে ব্যতীত সত্তাশালী বলিয় সাব্যস্ত হয় না আর ব্রহ্ম প্রত্যেক বস্তুর প্রতীতিরূপ বলিয়া তাহার সম্বন্ধে ক্ষণভঙ্গুরত্বের অভিযোগও আনা যাইতে পারে না সুতরাং জীব প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম হওয়াতে তাহার আসল জীব নাম দেওয়ায় কোন প্রকার দোষ আসেনা যদ্যপি পরব্রহ্মের যেরূপ ঈশ্বর ভাব কল্পিত সেইরূপ জীবভাব ও বটে,

তথাপি অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অর্থাৎ আসল জিনিষের অবলম্বন ব্যতীত কখন অসম্ভব বলিয়া প্রত্যেক কল্পিত বস্তুর আসল তত্ত্ব বুঝিয়া ফিরিয়া ব্রহ্মই হইয়া দাঁড়ায় যেরূপ আসল জীব ব্রহ্ম ছাড়া অপর জিনিষ নহে, সেইরূপ এমন জিনিষ নাই, যাহার সম্বন্ধে আসল অংশকে ব্রহ্ম না বলা যাইতে পারে আসল বস্তু ব্রহ্ম বলিয়াই অধিকারী তাহার প্রত্যক্ষ করিয়া লোকোত্তর শান্তি উপভোগ করিতে পারে কেননা যে জিনিষ জগতের বাহিরে রহিয়াছে তাহার প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি অসম্ভব বলিলেই চলে তবে রূপ কথায় বিশ্বাস করিবার কথা স্বতন্ত্র।

আসল জীবকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেই মানুষ পরম পদে উপনীত হইয়া থাকে কেননা উহা যেরূপ নির্লেপ চির অমর, তেমনি আবার চিদানন্দ স্বরূপ অপ্রবুদ্ধ অবস্থাতে লোক এইরূপ বস্তুতেও মায়িক জিনিষের ভাব আরোপ করে এইজন্য মহাবাক্যে জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তুমি ব্রহ্ম আমি ব্রহ্ম প্রভৃতি মহাবাক্য সূচনা করিয়া দেয় যে, তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে মানুষ আসল জীবকে জানিত না। ঐ সময়ে তাহারা কেবল নকল জীবের মোহন মন্ত্রেই বিমোহিত ছিল পৃথিবীতে যদি সকলেই বামদেবের ন্যায় প্রবুদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিত তবে মহাবাক্য অবতারণার কোন সার্থকতা থাকিতনা মহা বাক্যের ন্যায় সমস্ত ঔপনিষদী বিদ্যাও অপ্রবুদ্ধকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কাজেই যখন আসল জীবের পরিজ্ঞানের উপর অভয়পদ প্রাপ্তি নির্ভর করিতেছে তখন উহা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসুর কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা উচিত কেননা অভয় পদে পৌঁছিতে না পারিলে মনুষ্য জন্মই নিষ্ফল হইয়া যায়। যাগ, যোগ, তপ ও ভক্তি সকলই আসল জীবের পরিজ্ঞানের তরে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, একমাত্র ব্রহ্মবিচারের যথাতথ্যরূপে আবির্ভাব হইলেই আসল জীব করস্থ লেখনীর ন্যায় অপরোক্ষ জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে

অজ্ঞান অবস্থাতে যে জীব পাপ পুণ্যে লিপ্ত, সুখে দুঃখে বিকৃত ও সার্দ্ধ ত্রিহস্ত শরীরের অভিমানে গ্রাসিত ছিল, সেই জীবই তত্ত্ব জ্ঞান হইলে নির্লেপ, একভাবাপন্ন ও দেহাভিমান বিমুক্ত বলিয়া জ্ঞানীর সর্ব্বদা প্রতীয়মান হইয়া থাকে জ্ঞানী আসল জীবকে নিখিল বন্ধন হইতে বিমুক্ত বলিয়াই অবধারণ করেন যে জিনিষ তাঁহার বোধগোচর হয়, তাহারই সাক্ষীরূপে ঐ জীব স্বতঃই ব্যক্ত হইয়া থাকে জ্ঞানীর পক্ষে যাহার সাক্ষী চৈতন্যরূপে আসল জীব ধরা না দেয়, এমন জিনিষ নাই বলিলেই হয় তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রাক্তন সময়ে যাহা শরীরের অভ্যন্তরে লুক্কাইত বলিয়া বোধ হইত, তাহাই প্রবোধ অবস্থাতে বিশ্বব্যাপী চিন্ময় জ্যোতি বিস্তার করিতে থাকে এমন কি তাহাকে বাদ দিলে প্রত্যেক জিনিষই সত্তাহীন অসার হইয়া দাঁড়ায় যে কোন জিনিষের সার অংশের দিকে মনঃসংযোগ করা যায় তাহাই আসল জীবে পরিণত হইয়া পড়ে। জ্ঞান অবস্থায় নকল জীব সর্ব্বথা বিলুপ্ত না হইলেও আসল জীবের অনুগত না হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারে না, জ্ঞানীর বিচারে এইরূপই সাব্যস্ত হয় যেরূপ অজ্ঞান অবস্থাতে প্রত্যেক ঘটনাই একমাত্র নকল জীবের সূচনা করিয়া দিত, প্রবুদ্ধ অবস্থাতে সেরূপ হয় না ইহাতে নকল জীবের সূচনা আসল জীবের আশ্রিতরূপেই হইয়া থাকে জ্ঞানী যদিও সমাধিতে নকল জীবকে আসল জীবে বিলীন করিয়া ফেলেন, তথাপি ব্যুত্থানে নকল জীবের লীলা রসরঙ্গ ও তাঁহার প্রতীয়মান হইয়া থাকে, কেননা ব্যুত্থানকালে জ্ঞানীর যখন মনোবোধ ও ইন্দ্রিয়বোধ হইয়া থাকে, তখন উভয়কে অবশ্যই নকল জীবেরই লীলা বলিতে হয় আর এই বোধযুগলের সমষ্টি যে নকল জীবের প্রবৃত্তি নিমিত্ত তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ব্যুত্থানে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পার্থক্য এই যে, জ্ঞানী নকল জীবকে

আসল জীব দ্বারা প্রকাশিত ও তাহার আশ্রিত বলিয়া অনুভব করেন, আর অজ্ঞানী আসল জীবকে না দেখিয়া কেবল নকল জীবই দেখে তবে ইহা সত্য যে প্রথম, প্রতীয়মান মায়িক বস্তুকে অসত্য, এবং দ্বিতীয়; উহাকে সত্য বলিয়াই মনে করে যগুপি ব্যুত্থানে জ্ঞানী সর্ব্বতোভাবে নকল জীবের দায় এড়াইতে পারেনা তথাপি উহাকে মায়া বিজৃম্ভিত অসত্য বলিয়াই জানে অজ্ঞানী যেরূপ নকল জীবকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া ইষ্টানিষ্ট ঘটনার দাস হইয়া পড়ে, সেইরূপ জ্ঞানীকে কখন দেখা যায় না কেননা তিনি সুখে, দুঃখে, শোকে, হর্ষে একরূপই থাকেন এমন কি ব্যাঘ্র মুখে পতিত হইয়াও শিবোহহং ধ্বনি করিতে ক্ষান্ত হন না জ্ঞানীর এইরূপ মহত্ত্ব আছে বলিয়াই উপনিষদে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে "স যোহবৈ তৎ পরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" যাহা হউক, আসল জীবকে ভুলিয়া যাওয়া যে মহান অনর্থের কারণ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই কেননা যাহারা সংসারের আস্তাকুড়ে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি বিরল, যে আসল জীবকে নিঃসন্দেহে বুঝিয়া লইয়াছে কাজেই আসল জীবকে বুঝিয়া লইবার উপরে জ্ঞানীত্ব নির্ভর করিতেছে যাঁহার এই সম্বন্ধে ত্রুটী রহিয়াছে তাঁহাকে জ্ঞানী না বলিয়া অজ্ঞানী বলাই কর্ত্তব্য যগুপি আসল জীবকে না জানিয়াও ভক্তিরসে মাতিয়া উঠা যায়, তথাপি উহার পরিজ্ঞানাভাবে আবিদ্যার বন্ধন হইতে কিছুতেই অব্যাহতি পাওয়া যায় না আর ভক্তও যে ঐ বন্ধনের দায় হইতে মুক্তি পায় না তাহা উহার প্রভুবিয়োগজ অরুন্তুদ যাতনাই বুঝাইয়া দেয় কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে এইরূপ বিসম্বাদের সম্ভাবনা নাই এইজন্য যে, তাঁহার আরাধ্য দেব তিনি স্বয়ংই বটেন আর নিজের বিয়োগে যে কেহ অধীর হইয়া উঠে তাহার দৃষ্টান্তও নাই বলিলেই চলে বস্তুতঃ জ্ঞানীর ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানরূপ হওয়াতে

উহার বিয়োগই তাহার পক্ষে অসম্ভব কেননা যাহাতে প্রকাশরূপ জ্ঞানের অভাব ধরিয়া উঠিতে পারে যায় এইরূপ সময় মানুষের আসেনা ■ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই জ্ঞানের অখণ্ড প্রকাশ রহিয়াছে যদ্যপি অপ্রবুদ্ধ অবস্থাতেও জ্ঞান এইরূপ ভাবেই থাকে তথাপি আবরণরূপ অবিদ্যা উহাকে ঢাকিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে জ্ঞানীর উহা বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া জ্ঞানের প্রকাশ উপলব্ধিতে কোন অন্তরায় থাকেনা জ্ঞানী আমিই ব্রহ্ম এই প্রকার অখণ্ডাকার বৃত্তি রূপ অগ্নিতে অবিদ্যার আবরণ পুড়িয়া ছারখার করিয়া ফেলেন

আসল জীবকে বুঝিয়া লইবার জন্য যত প্রকার সাধন শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে অন্তর্জগতে নিত্যবস্তু নির্ব্বাচনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কেননা বহির্ব্বস্তুর বিশ্লেষণে অনেকেই বাহ্য জগতে নিত্যবস্তু না পাইয়া এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়া পড়েন যে, মানব বুদ্ধি নিত্য জিনিষকে বুঝিয়া লইতে পারেনা কাজেই অনুসন্ধিৎসার অভাবে ঐ জীব অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া যায় যদ্যপি অন্তর্জগতে নিত্যবস্তু নির্ব্বাচন করিতে যাইয়া যাহারা অজ্ঞেয়তার অন্ধকার আবিষ্কার করিয়া বসে এইরূপ লোকও আছে, তথাপি সাবধানতা অবলম্বন করিলে তৎক্ষণাৎ না হউক, সময়ে আসল জীব প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। কেননা উহা স্বতঃ প্রকাশ জ্ঞান ব্যতীত অপর কিছুই নহে আর জ্ঞান যে অন্তর্জগতের জিনিষ এই ধারণা আপামর সকলেরই দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে বাহ্য বস্তুর জটিল বিশ্লেষণের আবর্ত্তে লিপ্ত না হইয়া সহজসাধ্য অন্তর্জগতের সত্য জিনিষ নিরূপণেই তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ইহাতে বাহিরের উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না তরুতলে বসিয়াও অনায়াসে এইকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে তবে বুদ্ধি অমার্জ্জিত হইলে চলিবেনা বিশেষতঃ এই কার্য্য সম্পাদনের

জন্য গভীর বিচারের ও আবশ্যকতা আছে বিষয় উপরামের সুদীক্ষা ও এই বিষযে অন্যথা সিদ্ধ নহে এই জন্য যে, বিষয়াসক্তি প্রবল থাকিলে মানুষ অন্তর্মুখ হইতে পারেনা এবং অন্তর্মুখতার অভাবে যথাযথ রূপে বিচারের আবির্ভাব হইতে অল্পই দেখা যায় ।

অন্তর্জগতে সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভাব সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে কাহাকেও অপরভাবের সহভাবী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারা যায় না যখন সুখ আছে তখন দুঃখ নাই আর যখন দুঃখ থাকে তখন সুখ থাকেনা যদ্যপি ধারাবাহিক রূপেও সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভাবের অনুভূতি হইয়া থাকে তথাপি ঐ অনুভূতির সময়ে সুখ দুঃখ প্রভৃতির ন্যায় উহাদের অভাবও ধরা দেয়। অর্থাৎ প্রথমে সুখ পরে তাহার অভাব অনুভূত হয়, কিন্তু অখণ্ডরূপে ঐগুলির অনুভূতি অন্তঃকরণে স্থায়ী হয়না যেরূপ অনুভূতি সুখ প্রভৃতি বুঝাইয়া দেয় সেইরূপ উহাদের অভাবও উহা হইতেই ধরা পড়ে কাজেই বুঝিতে পারা যায় যে কেবল সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভাব সমূহের মধ্যে স্থায়ী বলিয়া কোন জিনিষ নাই পক্ষান্তরে এই ভাবগুলির মধ্যে কোন একটাও যদি জ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে থাকিতে পারিত, তবে জ্ঞানের ন্যায় উহাকে স্বতন্ত্র সত্তাশালী বলিলে কোন অন্যায় হইতনা। কিন্তু দেখিতেছি বিপরীত, জ্ঞান ব্যতিরেকে উহার অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না সুতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, জ্ঞানাতিরিক্ত ভাবমাত্রই ক্ষণভঙ্গুর ও জ্ঞানাশ্রিত। যদ্যপি সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভাবগুলি যেরূপ ক্ষণ বিনাশী, সেইরূপ তাহাদের জ্ঞানও মনে হয়, তথাপি এইরূপ মনে হওয়াটা অজ্ঞানীরই আপন সম্পত্তি কেননা জ্ঞানীর ধারণা এইরূপ যে, 'মাসাব্দ যুগ কল্পেষু গতা গম্যেষনেকধা নোদেতিনাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা চির-প্রভ।" এইস্থলে ইহাও বিবেচ্য যে, ঐ ভাব সমূহ যেরূপ পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতির সেইরূপ উহাদিগের জ্ঞান নহে এইজন্য যে, জল ও

অগ্নির পার্থক্য অনুভব করিতে পারিলেও উভয়ের জ্ঞান সম্বন্ধে ভিন্নতার লেশও অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না আর পাগল ব্যতীত এমন কে আছে যে জল ও অগ্নির ন্যায় উহাদের জ্ঞানকেও শীতল বা উষ্ণ মনে করে তবে বিষয়েরধর্ম্ম জ্ঞানে আরোপ করিয়া লইবার কথা স্বতন্ত্র

জ্ঞান নিরবয়ব, সুতরাং তাহাকে অখণ্ড জিনিষ বলাই উচিত আর সখণ্ড ভাব যে সাবয়ব পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম, তাহার উদাহরণ সচরাচরই পাওয় যায় এইরূপে প্রত্যেক জিনিষই জ্ঞানাশ্রিত, এইজন্য জ্ঞানকেই সর্ব্বব্যাপি বলিতে হইবে এখন, নিত্যবস্তু পরব্রহ্ম বা আসলজীবের সমস্ত লক্ষণই যখন জ্ঞানে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাঁহাকেই ঐ বস্তু বলিয়া সাব্যস্ত করা উচিত যাঁহারা জ্ঞানকে বাদ দিয়া ঐ বস্তুর অনুসন্ধান করিতে যায়, তাহারা অজ্ঞেয়তাবাদ বা সন্দেহবাদের অন্ধকারেই পড়িয়া থাকে ইহার কারণ এই যে, মায়িক বস্তু মাত্রই ক্ষণবিধ্বংশিতার স্রোতে প্রবহমান, ইহা যেরূপ সুস্পষ্ট ভাবে তাহারা বুঝিতে পারে সেইরূপ নিত্যবস্তু যে স্বতঃ অপরোক্ষ, এই সত্য ধরিয়া লইতে সক্ষম হয় না যদ্যপি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ও এই সত্যকে হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষতঃ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তথাপি ইহার দৃঢ় পরোক্ষ জ্ঞানে তিনি বঞ্চিত হন ন নিষ্ঠাবান্ জিজ্ঞাসুর মনে নিত্য বস্তু নাই কখনও এইরূপ ভাব সমুদিত হয় না অন্তর্মুখতা সহকারে আন্তরিক ভাবগুলির তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেই স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানকে তিনি আসল জীব বলিয়া বুঝিতে পারেন কেনন জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই জ্ঞান একভাবে বর্ত্তমান থাকে কোন অবস্থাতেই যেরূপ উহার অভাব দেখা যায়না, সেইরূপ স্বগত পৃথক ভাব ও অনুসন্ধানে ধরা পড়েনা তবে উহাকে বিষয়ের সহিত একাকার করিয়া লইলে স্বতন্ত্র কথা

জ্ঞানকে আসল জীব বলিয়া প্রত্যক্ষতঃ বুঝিতে পারিলেই পরম শান্তি আসিয়া মানুষকে আলিঙ্গন করে এইজন্য যে, কখনও ইহার বিয়োগ জনিত সন্তাপের সম্ভাবনা নাই আর জ্ঞানশূন্য অবস্থা বা ঘটনা যে কল্পনাতেও আসেনা তাহাতেইবা কি সন্দেহ আছে? কাজেই অন্তর্জগতের জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ জ্ঞানকে বলাই যুক্তি সঙ্গত যাহারা জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কোন পরোক্ষ বস্তুকেই আত্মা বলিয়া ধরিয় লয়, তাহাদের জীবন অশান্তিতেই কাটিয়া যায় কেননা অপ্রত্যক্ষ বস্তুর সন্দেহ যেরূপ সহজে যায় ন উহার প্রতি আশানুরূপ প্রেমের সঞ্চারও সেইরূপ সহজে হয় না বক্ত মাংসময় শরীর প্রত্যক্ষতঃ অনুভূত হয় বলিয়াই মানুষ তাহার প্রেমে অধীর হইয়া উঠে এই জন্যই পরোক্ষাত্মবাদীর সমস্ত কার্য্যের মূলেই দৈহিক সুখের শ্রীবৃদ্ধি প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে এই মহোদয় যাহ সাক্ষাৎ বা পরম্পরা রূপে এই সুখের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট নহে সেইরূপ কার্য্যকে অবিমৃষ্যকারীর কার্য্য বলিয়াই জানেন যাহাই হউক, অন্তর্জগতে নিত্য বস্তুর নির্ব্বাচন করিতে গেলে, পরিশেষে জ্ঞানেই যাইয়া উপনীত হইতে হয় এবং জ্ঞানকেই নিখিল ভাবের যেরূপ অপরিহার্য্য আশ্রয় বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ উহা ব্যতীত প্রত্যেক ভাবের অপর কোন আসল স্বরূপই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বোধ হয় জ্ঞান সমুদ্রে ভাবরূপ বুদ্বুদ্ উঠিয়াই বিলীন হইয় যাইতেছে আর এইরূপ অবস্থাতেও যে জ্ঞানের দায় এড়াইয়া বুদ্ধির অগম্য জিনিষকে আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহার শ্লাঘা লইয়াই বা কিরূপে লেখনী চালনা করা যায়?

অবোধ লোক স্বতঃ অপরোক্ষ জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া যে কত উপদ্রব, কত অশান্তি ভোগ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না সম্মুখস্থ কাঞ্চনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া দূরস্থ কাচের জন্য ছুটিয়া যাইতেছে এই অবিমৃষ্যকারীতার অপরাধ ও সামান্য নহে কেননা

জ্ঞানকে যথাযথ রূপে ধরিয়া লইতে পারিলে সকল অনর্থ আপনা আপনিই বিদূরিত হইয়া যায়। বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যা যখন প্রতিবোধ-বিদিত বলিয়া জ্ঞানকে ঘোষণা করিয়াছে, তখন তাহাকে ধরিয়া লইবার সম্বন্ধে আকাশের চাঁদ ধরার ন্যায় অসম্ভব মনে করা মূর্খতারই কার্য্য। মূর্খই মনে করে যে জ্ঞানকে আমি জানিতেছি না। দুঃখের বিষয় এইরূপ মূর্খতাকেও কৃতবিদ্যতার পরিচ্ছদেই দেখা যায়। কৃতবিদ্য লোকও এইরূপ ভাব পোষণ করিয়া থাকেন। তবে বর্ত্তমান সভ্যতার দিক দিয়া দেখিলে, ইহাকে দূরদর্শিতার বিরোধী বলিয়া মনে হয় না। যাহাই হউক, জ্ঞানকে যথাযথরূপে বুঝিয়া লইবার উপরেই যে বিশেষদর্শিত্ব নির্ভর করে, তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। যদিও জ্ঞানের ন্যায় সত্তা এবং সুখকেও ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বলা হইয়াছে তথাপি উভয়ই বিচারে জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত প্রতিপন্ন হয় না বলিয়া জ্ঞানকেই পুরোবর্ত্তী করিতে হইবে। এই স্থলে ইহাও সবিশেষ ভাবে বিবেচ্য যে, জ্ঞানাতিরিক্ত জিনিষ মাত্রই যখন বিষয়, তখন সত্তা ও সুখকে জ্ঞানের সহিত অভিন্ন না বলিলে উভয়েই বিষয়ের অন্তঃপাতী হইয়া দাঁড়ায়, এবং এই জন্য অনিত্যতার কবলে পতিত না হইয়া থাকিতে পারেনা, যেহেতু বিষয় যে নিত্য হইতে পারে এমন কোন উদাহরণ নাই; কাজেই বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, সত্তা বল আর আনন্দ বল, জ্ঞান ব্যতীত কিছুই প্রতীয়মান হইবার নহে। কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি আসেনা এইজন্য যে, উহা স্বয়ং প্রকাশ। সুতরাং অন্তর্জগতের আসল তত্ত্ব নিরূপণ জ্ঞানকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়া লইবার উপরে যে নির্ভর করিতেছে তাহা জানিতে বাকি রহিলনা। আর জ্ঞানই যে ব্রহ্ম অর্থাৎ আসল জীব তাহাও পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্ম ও মায়া।

বিশ্ব সমষ্টির যে অংশ নিত্য নির্ব্বিকার ও সদা এক ভাবাপন্ন তাহাই ব্রহ্ম ; কিন্তু মানুষ জগতের আদি কারণকেই ব্রহ্ম শব্দের অভিধেয় বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চায় তাহাদের বক্তব্য এই যে, সামান্য দ্রব্যও যখন একজন নির্ম্মাতা ব্যতিরেকে হইতে পারে না, তখন এই জল স্থলময়ী, পর্ব্বতকাননসঙ্কুলা জীবপরিপূর্ণা পৃথ্বী, এবং সূর্য্য চন্দ্র ■ অসংখ্য গ্রহ তারকাবিমণ্ডিত সৌরজগৎ যে সহসা বর্ত্তমান আকারে আবির্ভূত হইয়াছে এরূপ কল্পনা নিতান্তই অসঙ্গত। অতএব ইহার একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন শিল্পজ্ঞ ব্যক্তির নির্দেশ ক্রমেই যেমন তদধীনস্থ কার্য্যকারকগণ কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে তদ্রূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর আদেশ মতেই অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া সৃষ্টি বিস্তার করিতেছেন। সুতরাং ব্রহ্ম কার্য্যতঃ নির্লিপ্তই আছেন কেননা তিনি হাতে হেতেরে কিছুই করেন না সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে মায়া কারণ স্বরূপে দৃষ্ট হইলেও মূল কারণ ব্রহ্মই সাব্যস্ত হইতেছে। বেদান্তকে বাদ দিয়া যত ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, ঐ সমস্ত গ্রন্থেই জগৎকারণ ভাবকে ব্রহ্মের মুখ্য বা অব্যভিচারী লক্ষণ বলা হইয়াছে জগৎ কারণ মায়া যদিও ব্রহ্মের অবলম্বন ব্যতীত এক নিমেষকালও স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারেনা তথাপি তাহার কৃতিসৌগুণ্য বা বৈগুণ্যে ব্রহ্ম নির্লিপ্তই রহিয়াছেন। কেননা এই বিষয়ে লিপ্ত হইলে তিনি ব্রহ্ম না হইয়া অব্রহ্মেই পরিণত হইয়া পড়েন। আর এইপ্রকার ভাব যে বিকৃতি বা পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়া দেয়, তাহার অনেক উদাহরণও রহিয়াছে। কারণের

প্রকৃতিতে কল্যাণ গুণের সংপ্রযোগ করিলেও কাবংকে বিকৃতির কলঙ্ক হইতে মুক্ত রাখিতে পারা যায়না ইহার হেতু এই যে পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি না ঘটিলে কারণেরই কোন অর্থ হয় না কারণ কার্য্য উৎপাদনের পূর্ব্বে বা পরে যে ভাবে থাকে, কার্য্য উৎপত্তির সময়ে তাহা হইতে তদীয় বিলক্ষণ ভাবই দেখিতে পাওয়া যায় কেবল যে উপাদান কারণ সম্বন্ধেই বিকৃতির আশ্রলাভ হয তাহা নহে, নিমিত্ত কারণকেও ইহার দাযে পড়িতে দেখা যায় মৃত্তিকার ন্যায় কুম্ভকার পৃথুবুধ্নোদরাকৃতি না হইয়া পড়িলেও তাহার করযুগলের ক্রিয়াগত বিকৃতি প্রত্যক্ষতঃ ধরা পড়ে। কাজেই যাঁহাবা প্রভুকে জগতেব নিমিত্ত কারণ জানিয়াও নির্ব্বিকার মনে করেন, তাঁহাদের কি প্রকাবে শ্লাঘা করা যায ? দয়া, ন্যাযপরতা, সর্ব্বদর্শিত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি সদ্গুণ বা কল্যাণ গুণে মনের সাধ মিটাইয়া প্রভুকে সুসজ্জিত করিলেও জগৎকারণ বলিবা মাত্রই তাহাতে বিকারের মসিবিন্দু নিক্ষিপ্ত হইবেই ; তবে অন্ধবিশ্বাসের বস্ত্রখণ্ড দ্বাবা উহা মুছিয়া ফেলার কথা স্বতন্ত্র।

ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের প্রভুকে জগতের কারণ বলিয়া প্রথিত করাতে বড়ই গোলযোগে পড়িযাছেন এই জন্য যে, একদিক গড়িতে গেলেই অপরদিক ভাঙ্গিয়া যায় আব জগতে এমন কোন কার্য্য নাই বলিলেই চলে, যাহা একমাত্র গুণেরই পরিচয় দেয়। মনে করা যাউক যে, কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি বিদ্যালযের জন্য বিংশতি লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা দান করিলেন। অবশ্যই এই অসামান্য কার্য্য দানকারীর সদ্গুণ জ্ঞাপন করিয়া দেয়, কিন্তু ইহার মূলে যে প্রচ্ছন্নভাবে নাম কিনিবার ইচ্ছা নাই, তাহা নিশ্চয করিয়া কে বলিতে পারে ? আবার পৃথিবীর অনেক মহানুষ্ঠান যে লোকৈষণা মূলক তাহার উদাহরণও সচরাচর পাওযা যায়, সুতরাং প্রভুকে কল্যাণ গুণের সুগন্ধি কুসুমমালা পরাইলেও

দোষের দুর্গন্ধ সমূলে বিদূরিত হইবার নহে তবে ইহা সত্য যে যাহার দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগ অধিক এরূপ ব্যক্তিও আছেন ;— রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণচন্দ্রের পদস্পর্শেও বসুন্ধরা পবিত্র হইয়াছে যদিও ভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের প্রভুর সমস্ত কার্য্যই লোকোত্তর বা মানব বুদ্ধির অগম্য, তথাপি বিচারশীল ব্যক্তির মনে যাহা বুদ্ধির অগম্য সেই সম্বন্ধে কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া লওয়া ভ্রান্তিতেই পরিণত হইয়া পড়ে এইরূপ ভাব না আসিয়া থাকে না আর লোকোত্তর বস্তুতে লোকের গুণ লাগাইয়া দেওয়াকেই বা কি প্রকারে সুবিবেচনার কার্য্য বলা যায় ? যাহাই হউক, ঈশ্বরকে জগৎকারণ বলিলে তাঁহার নির্দ্দোষ ভাব সাব্যস্ত করা অসম্ভব

যাহা এক রস এবং কখনও পরিবর্ত্তনে আসে না এইরূপ জিনিষ যে কারণ হইতে পারে, তাহার উদাহরণ নাই সুতরাং অপরিবর্ত্তনীয় প্রকৃতি ও সদা একভাবাপন্ন ব্রহ্মকে কিরূপে জগৎকারণ বলিয়া প্রথিত করিতে পারা যায় ? আর যখন কার্য্য কারণ ভাবের চৌহদ্দির ভিতরে যে কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই বিচারে অনিত্য বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তখন ব্রহ্মকে জগতের আদি কারণ করিয়া তুলা আর অব্রহ্মে পরিণত করা একই কথা অনেক দার্শনিকই কার্য্য কারণ ভাবের অতীত যে কোন জিনিষ আছে তাহার খবর পান নাই তাহারা "গোত্রহারা হইলেই কশ্যপ গোত্র" নীতিতে জগতের আদি কারণের পরিজ্ঞানেই বস্তুতত্ত্ব জ্ঞানের পর্য্যবসান করিয়া লইয়াছিলেন কাজেই গুণ ও ক্রিয়া ব্যতীত কারণ অকারণ হইয়া উঠে এইজন্য আদি কারণকে গুণ ও ক্রিয়ার আধার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যাহাই হউক, জগতের আদি কারণ যে অনির্ব্বচনীয় তাহা বলিতেই হইবে এইজন্য যে, তাহাকে যেরূপ পরিণাম হয় বলিয়া ব্রহ্মের ন্যায় সদ্‌বস্তু বলিতে পারা যায় না, সেইরূপ তাহার কার্য্যাবলি প্রতীতি

গোচর হইয়া থাকে এইজন্য বন্ধ্যা পুত্রের ন্যায় অসৎ বলাও যুক্তি বিরুদ্ধ অধিকন্তু এই শ্রেণীর মধ্যেও মতবৈষম্য রহিয়াছে কেহ নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরকে কেহ পরমাণুর সহযোগী তাঁহাকে যেরূপ জগৎ-কারণ সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ অপর লোকে নিরবচ্ছিন্ন পরমাণু ও প্রকৃতিকে ঐরূপ বলিতে ছাড়েন নাই যদিও এই শ্রেণীর প্রণীত গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে তথাপি ঐ গ্রন্থ পড়িয়া মূল বস্তুর পরিজ্ঞান লাভ করা সহজ নহে ; তবে ইহা সত্য যে ঐ গ্রন্থ পড়িলে বুদ্ধি সুমার্জ্জিত না হইয়া থাকে না কেননা উহা যেরূপ গভীর গবেষণাপূর্ণ সেইরূপ সুযুক্তিতেও অলঙ্কৃত পক্ষান্তরে পৃথিবীতে এমন লোক কমই বাস করে, মূলবস্তু জানিবার জন্য যাহাদের তীব্র ইচ্ছা হইয়া থাকে। কাজেই এইরূপ লোক যদি যুক্তি ও গবেষণার পুস্তক না পড়িয়া প্রেমের কাহিনী ও উপকথায়ই আত্মহারা হইয়া যায় তবে বড়ই অনর্থপাতের সম্ভাবনা যদিও ঐরূপ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অনেকেই আস্তিকতায় জলাঞ্জলি দিয়া বসে, তথাপি উন্নতভাব ও উদারতা তাহাদিগকে উপেক্ষা করে না, কেননা সুশিক্ষার প্রভাবই ঐরূপ

কারণের প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারাও কারণকে নিত্যবস্তু মনে করার হেতু। মানুষ আপাতদৃষ্টিতে স্বর্ণকার ও লৌহ-কার প্রভৃতিকে অপরিবর্ত্তনীয় এবং সুবর্ণ ও লৌহকে পরিবর্ত্তনশীল মনে করিয়া তাহার আনুরূপ্যে জগতের অনিত্য পরিণাম উপাদান ও নিত্য নিমিত্ত কারণ কল্পনা করিয়া লইয়াছে যদি তাহারা সুগভীর ভাবে কারণের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিত তবে কখনও জগৎকারণকে নিত্য বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিতে সাহস করিত না কেননা উপাদান বা নিমিত্ত যে কোন কারণই হউক, উহা যে পরিবর্ত্তন প্রকৃতির তাহা বলিতেই হইবে আর এইরূপ না বলিলে

যে কারণত্বই নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায় তাহ পূর্ব্বেই সূচনা করা গিয়াছে তবে যে বেদান্ত শাস্ত্রে পরব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য ইহাই বটে যে, কলস ও কুণ্ডল প্রভৃতি কার্য্য হইতে মৃৎ সুবর্ণ প্রভৃতি কারণকে যেমন ভিন্ন দেখা যায় না, সেইরূপ জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নতা জ্ঞাপন করা এই জন্যই "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তবোধাৎ" সূত্রে ব্রহ্মকে অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণ বলা হইয়াছে কেননা অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণ লূতাকে তন্তুর সহিত অপৃথক্ ভাবাপন্ন হইতে দেখা যায় আর কেবল নিমিত্ত কারণ ও কার্য্যের তাদাত্ম্য ভাব অসম্ভবই বটে কাজেই ব্রহ্ম কারণবাদের ভাবার্থ ইহ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? যদ্যপি আক্ষরিক অর্থের গোড়া মহাশয়েরা ব্রহ্মকে কারণত্বের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছ অভ্যস্ত তথাপি বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহ মহামায়ার উপরেই নিক্ষেপ করেন অনেক আপাতদর্শী আবার মায়া ও ব্রহ্মকে একাকার করিয়া মায়ার সহিত ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া ধরিয়া লয় পরন্তু এই শ্রেণীর লোক অপ্রবুদ্ধ সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায় যাহাই হউক "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে কার্য্যকারণ ভাবের সংস্পর্শে নির্লিপ্ত বলিয়া ঘোষণা করে, তখন তাঁহাকে জগৎকারণ মনে করাতে শ্রুতিবিরুদ্ধতাও প্রতিপন্ন হইয়া থাকে

জগৎকারণ মায়া ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র সত্তাশালী নহে, এবং প্রত্যেক অঙ্গ বিক্ষেপেই ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখে এইজন্য অবিশেষদর্শী মায়ার কারণ ভাবটা ব্রহ্মের উপরও আরোপ করিয়া লয় যদ্যপি ব্রহ্ম ও মায়ার আশ্রয় বা অধিষ্ঠান রূপেই বর্ত্তমান থাকে, তথাপি মায়া যেরূপ পরিণাম বা পরিবর্ত্তনে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে, ব্রহ্ম সেরূপ নহে,— সর্ব্বদাই একভাবাপন্ন অর্থাৎ মায়া কেবল জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে নানাপ্রকার পরিণাম বা বিকারের খেলা খেলিতেছে আর ব্রহ্ম সকল

অবস্থাতেই নির্ব্বিকার এক রস রহিয়াছে ব্রহ্ম যেরূপ স্বরূপতঃ বা স্বভাবতঃ অনাদি অনন্ত, মায়া সেইরূপ না হইলেও প্রবাহরূপে তাহাকে অনাদি অনন্ত না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না মায়াশূন্য কাল যে কেবল কল্পনারই শ্রীবৃদ্ধি করে বিচারশীল ব্যক্তির তাহা অজ্ঞাত নহে; কাজেই ব্রহ্ম কোনো কোন মায়িক ঘটনার সাক্ষীরূপেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে এই অবিসম্বাদিত সত্যই বিবেকীর বিচারে সাব্যস্ত হয় শুদ্ধ ও নির্লেপ ব্রহ্মের অর্থ উহা মায়িক ব্যাপারে নির্ব্বিকার ও এক ভাবাপন্ন থাকে সমাধিতে ও ব্রহ্মাকারে পরিণত বা ব্রহ্মে বিলীন মায়া অবশ্যই মানিতে হইবে কেননা সর্ব্বথা তাহার অভাব মানিলে সমাধিস্থ ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সমকক্ষ হইয়া পড়ে। তবে ইহা সত্য যে, সমাধিস্থ ব্যক্তির দিক দিয়া দেখিলে মায়া নাই বলিলেই চলে আর অপরের প্রতীয়মান মায়াতে যে তাঁহার কিছুই আসে যায় না ইহাতেই বা কি সন্দেহ আছে? যদ্যপি সুষুপ্তি অবস্থাতে কার্য্য ভাবাপন্ন মায়ার তিরোধান হইয়া থাকে তথাপি আমি কিছুই জানিতে ছিলাম না সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতি বুঝাইয়া দেয় যে, ঐ অবস্থাতেও কারণ রূপিণী মায়া প্রতীয়মান হয় কাজেই ইহা সূচিত না হইয়া থাকিলনা যে, মায়ার প্রতীতি ও অপ্রতীতিতে সুষুপ্তির ও সমাধির পার্থক্য

প্রত্যেক জিনিষেই বিশেষদর্শীর পক্ষে পরব্রহ্ম ধরা পড়ে মায়-ময় গুণের স্তর অতিক্রম করিয়া উঠিলেই উজ্জ্বল ব্রহ্মসত্তা আসিয়া সম্মুখে খাড়া হয়। কেন না জ্ঞান নিখিল বস্তুর অপরিহার্য্য অবলম্বন বলিয়া উহা ব্যতীত ক্ষণকালও কোন জিনিষ তিষ্ঠিতে পারে না আর জ্ঞান যে ব্রহ্মের অব্যভিচারী স্বরূপ লক্ষণ ইহা পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে কাজেই ঘুরিয়া ফিরিয়া দাড়াইল যে, ব্রহ্মশূন্য বস্তুই অসম্ভব। অবশ্যই ব্রহ্ম যদি লোকোত্তর রাজ্যের সম্রাট হইত তবে বস্তু দর্শনের সময় ব্রহ্ম দর্শন হইত না, কিন্তু ইহা বিচারে মানব মনের

কল্পনা প্রসূত বলিয়াই সাব্যস্ত হয় যদ্যপি জ্ঞানকেও অনেকে জ্ঞেয়-বস্তু রূপেই ধরিয়া লয় তথাপি কোন জিনিষের যখন অভাব অনুভূত হইয়া থাকে তখন জ্ঞান যে প্রতীয়মান বিষয় হইতে স্বতন্ত্র বস্তু এই সত্যই ব্যক্ত হইয়া পড়ে কেন না জ্ঞান কোনরূপেই অভাব রূপ প্রতিপন্ন হইতে পারে না তবে ইহা সত্য যে বিষয় ও বিষয়ের অন্যোন্যাধ্যাসটা মানুষের পক্ষে নৈসর্গিক হইয়া দাড়াইয়াছে এমন লোক বিরল বলিলেই হয়, যিনি জীবনের কোন না কোন সময়ে এই অধ্যাসের মোহে পড়িয়া আপনাকে অমানুষিক ভাবে কলঙ্কিত না করিয়াছেন যাহাই হউক, জ্ঞানকে যথাযথ ভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারিলে প্রত্যেক ঘটনাতেই ব্রহ্ম দর্শন জনিত সুখ লাভ করিতে পারা যায় অর্থাৎ "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" মহা বাক্যের অর্থ সম্যক্‌রূপে অবগত হইলে অভয় পদ প্রাপ্তির কোন অন্তরায় থাকে না।

ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ হওয়াতে ইহাও বুঝিতে পারা গেল যে, ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গ লঙ্ঘন করিতে হয় না অন্তর্ব্বাহ্য প্রত্যেক ঘটনার প্রকাশ রূপে জ্ঞানী ব্রহ্মানুভব করিতে পারেন যাহার সাক্ষীরূপে আনন্দ সন্দোহনকারী চিদাত্মা ধরা দেয় না এমন জিনিষ বা ঘটনা তত্ত্বদর্শীর পক্ষে নাই বলিলেই চলে তিনি যেরূপ তপস্বীর পর্ণকুটির ব্রহ্মজ্যোতিতে উজ্জল দেখেন সেইরূপ বিলাসীর উদ্যান ভবনেও আসল স্বরূপে একমাত্র চিন্ময় প্রকাশই দেখিতে পান। এমন কি শয়নে, জাগরণে, ভোজনে ও বিচরণে, তাঁহাকে ঐ প্রকাশের অভাব অনুভব করিতে হয় না কাজেই তাঁহার যখন নির্জ্জনে অবস্থিতি ঘটে, তখন যে তিনি চিদানন্দ সিন্ধুনীরে ডুবিয়া যান তাহার কথা কি? যদিও মনোবিক্ষেপের প্রাবল্যে মানুষ নির্জ্জনে বসিয়াও সংসারের আবর্জ্জনা ভাবিতে থাকে, তথাপি অন্তর্মুখ ব্রহ্মনিষ্ঠ যতির মনে এইরূপ কুভাবনা কখনই আসেনা। তবে অন্তর্মুখিতা লাভ

করিবার জন্য যে বিপুল আয়োজন করিতে হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই যাহাই হউক দীর্ঘকাল নির্জ্জনে বাস করা সকলের কর্ম্ম নহে বিষয়ীর ত কোন কথাই নাই, অনেক জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানীও ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া পড়েন ইহার কারণ যে অন্তর্মুখতার অভাব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কারণ অন্তর্মুখ না হইতে পারিলে আসঙ্গলিপ্সাকে থামাইয়া রাখা বড়ই কঠিন আর ইহাও অসত্য নহে যে, অনেকে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়াও সেবক সেবিকার সাহায্য ত্যাগ করিতে পারেন না।

ব্রহ্মাবস্থাতে ব্রহ্মের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে জ্ঞানে তাহার সমন্বয় হয় বলিয়া জ্ঞানকেই ব্রহ্মরূপে বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য আবার জ্ঞানকে ব্রহ্ম অবধারণ করিয়া যদিও অনেকে তাহা মানব বুদ্ধির অগম্য লোকোত্তর জিনিষ বলিয়াই জানে, তথাপি ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বদর্শী এইরূপ নহে এমনকি অপবিত্র বস্তুর জ্ঞানকেও তিনি ব্রহ্মস্বরূপেই অবগত হইয়া থাকেন অবশ্যই বিষয়গত পার্থক্য সংস্কার তাঁহার হৃদয় সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করে না কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে কখন তাঁহার বৈষম্য ধারণা হইতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে সত্তা ও আনন্দে যে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও বিচারে জ্ঞান ব্যতীত অপর জিনিষ সাব্যস্ত হয় না যখন জ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিলে সত্তা ও আনন্দ প্রতীতি গোচর হয় না এবং উভয়ের অপেক্ষা ব্যতীত ও জ্ঞান আপনা আপনি প্রকাশমান হয় তখন জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা ও আনন্দ স্বীকার করিয়া ভেদবাদের জঞ্জালে পরা বিধেয় নহে জ্ঞানই দুঃখ ও অভাবের অভাবরূপ-বলিয়া সত্তা এবং আনন্দ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে এক অখণ্ড জ্ঞানই সত্তা ও আনন্দের সহিত তাদাত্ম্যভাবাপন্ন হইয়া দুঃখ এবং শূন্যবাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে যদিও ভ্রান্তদৃষ্টিতে উহাদিগকে জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধহয়

তথাপি গভীর ভাবে বিচার করিলে তিন জিনিসই এক হইয়া দাঁড়ায়। তবে ইহা সত্য যে লৌকিক সুখ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু। যেমন উহা মনঃসমুদ্রেরই তরঙ্গ মাত্র।

মায়া ব্রহ্মের বিপরীত বলিয়াই প্রথিত। সুতরাং তাহাকে মিথ্যা, জড়, সবিকার, গুণময়, অনির্বচনীয় ও অস্বতন্ত্র প্রভৃতি বলা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে জগৎ সমষ্টির যে ভাগ পরিবর্তন ও বিকৃতি স্বভাব তাহাই মায়া। মায়া যদিও বিবিধ প্রকার পরিণামের খেলা খেলিয়া অবোধ লোকের মন বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত ইহার কোন পৃথক সত্তা নাই। এমনকি ক্ষণকালও ইহা ব্রহ্মের শাসনের দায় এড়াইতে পারে না। এইজন্য জ্ঞানী ইহাকে ব্রহ্মসংযোগেই দেখিয়া থাকেন। একমাত্র অজ্ঞানীই অন্ধ পরম্পরা রীতিতে ব্রহ্মশূন্য মায়া উপলব্ধি করিয়া ত্রিতাপে দগ্ধ হয়। ব্রহ্মের সংযোগে মায়া দেখিয়া লোক বন্ধনের যন্ত্রণা হইতে এইজন্য অব্যাহতি পায় যে প্রথমের সহিত তুলনা করিলে দ্বিতীয় সত্তাহীন অসার হইয়া দাঁড়ায়। যেরূপ তুলনার প্রভাবে মায়ার অসারত্ব আমরা বুঝিয়া লইতে পারি সেইরূপ উহা হইতে ব্রহ্মের মহত্ত্বও ব্যক্ত হইয়া পড়ে। অন্ধকারের সহিত তুলনা করিতে না পারিলে কি শারদজ্যোৎস্নার গৌরব অনুভব করিতে পারা যায়? কাজেই মায়ার অশেষ দোষ থাকিলেও উহা আছে বলিয়াই মানুষ ব্রহ্মানন্দরসের উপভোগের অধিকারী হয়। মায়াই ব্রহ্মাকার বৃত্তিতে পরিণত হইয়া সকল বন্ধনের জঞ্জাল মিটাইয়া দেয়। ইহাই সুষুপ্তিতে মনকে বিলীন করিয়া এক ভাবাপন্ন কারণ অবস্থাতে উপনীত হয় বলিয়া জীব যে নানাত্বের কঞ্চুক বিমুক্ত, এই প্রকৃত তত্ত্ব মানুষ ধরিয়া ফেলিতে পারে। ফল কথা ভাল বা মন্দ যে কোন ঘটনা ঘটে ঐ সমস্তই মায়া বিজৃম্ভিত। যাহা মায়ার কৃতিনৈপুণ্য সূচনা না করে এইরূপ ঘটনাই নাই। যদ্যপি ঘটনা সমষ্টি ছাড়া মায়ার স্বরূপগত

কোন ব্যাখ্যা হয় না, তথাপি ব্যষ্টি ঘটনা হইতে ইহাকে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় আর ব্যষ্টির ভেদসমন্বয় যে সমষ্টিতে হয় তাহার উদাহরণ বৃক্ষ সমষ্টিরূপ বনেই পাওয়া যায়

ঘটনা শূন্য কাল অনুসন্ধানে পাওয়া যায়না বলিয়া মায়া প্রবাহরূপে অনাদি অনন্ত যদ্যপি কোন না কোন প্রবাহ সর্ব্বদাই থাকে, তথাপি বিচারে ঐগুলি ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই সাব্যস্ত হয় তবে ইহা সত্য যে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে উপনীত হইলে ব্যক্তিগত ভাবে ঘটনা প্রতীতি গোচর হয় না কাজেই যাঁহার কখন ব্যুত্থান হয় না তাঁহার পক্ষে মায়া নাই বলিলেই চলে। যাহাই হউক, যখন ঐরূপ অবস্থা লাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটেনা তখন অপর ব্যক্তির পক্ষে যে মায়া থাকে ইহ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় অবশ্যই এস্থলে বিচার পূর্ব্বক নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে যে অজ্ঞানী ও ব্যুত্থান অবস্থার জ্ঞানীর তুল্যভাবে মায়িক ঘটনা প্রতীয়মান্ হইলেও প্রথম উহাকে সত্য ও দ্বিতীয় অসত্য জানে কেননা বাধজ্ঞান ও তদভাবে উভয়ের বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় বাধ জ্ঞানের অর্থ ব্রহ্মসত্তা হইতে ঘটনা সমষ্টিরূপ মায়ার ত্রিকালে স্বতন্ত্র সত্তা নাই এইরূপ নিশ্চয়। সুতরাং এইক্ষণে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে এই প্রকার বাধজ্ঞানের ভাবাভাবই জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর ইতর ভেদক অসাধারণ লক্ষণ পক্ষান্তরে জ্ঞান লাভ হইলে লোকোত্তর শক্তি জন্মে এইরূপ কিম্বদন্তী অমূলক বোধ হয় বলিয়া অমানুষিক কার্য্য কলাপকে জ্ঞানীর লক্ষণ বলিতে পারা যায় না যদ্যপি প্রাচীন সংস্কারের শিক্ষিত অশিক্ষিত ও মহিলা সমাজে ইহাই জ্ঞানীর স্বগত অসাধারণ লক্ষণ অবধারিত হয় তথাপি বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সকলকে ব্যভিচার দোষে দূষিত বলিয়াই জানেন

মায়া প্রবাহরূপে নিত্য, এবং সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কারিণী বলিয়া

শাক্ত সম্প্রদায় তাহাকে ব্রহ্ম স্থানীয় বুঝিয়া লইয়াছে কিন্তু ব্রহ্মসত্তা হইতে যে তাহার পৃথক সত্তা নাই ইহা মনে আসিলে কিছুতেই ঐ মতের শ্লাঘা করা যায় না আর পরিবর্তনশীল জিনিষ ব্যতীত অপর কিছু কারণ হইতে পারেনা এইজন্য বিচারে মায়া অনিত্য সাব্যস্ত না হইয়া থাকে না কাজেই মায়া জগৎ কারণ হইলেও তাহার গৌরব লইয়া বিচারশীল ব্যক্তি ভাবে অচেতন হইতে পারে না যদ্যপি সংসারে কার্য্যকারণ ভাবের অধিক সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি প্রবুদ্ধ সমাজ ঐ ভাবের অতীত একরূপ চিদাত্মাকেই মূল বস্তু বলিয়া জানেন কেননা বিকারগ্রস্ত জিনিষকে মূল বস্তু বলিলে তাহার মূলত্বই অমূলক হইয়া পড়ে আর কিছুতেই যাহার অভাব বা পরিণাম ধরা পড়ে না, তাহাকে কেমন করিয়া মূল বস্তু না বলিয়া থাকিতে পারা যায়? তবে যে অনেকে মায়ার মূলবস্তুত্ব বিমোহে মোহিত হইয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ তাহারা মায়াকেই ব্রহ্ম বলিয়া বিনা প্রমাণে স্বীকার করিয়া লইয়াছে যদ্যপি কার্য্যের দিক দিয়া দেখিলে মায়ার মহিমা ঘোষণা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না, তথাপি গভীরভাবে বিচারে নিবিষ্ট হইলে ব্রহ্ম ব্যতীত তাহার যে কোন স্বতন্ত্র আসল স্বরূপ আছে তাহা কোন মতেই দেখা যায়না কিন্তু আপাতদর্শী স্বয়ং সত্তাশূন্য জিনিষ যে মনোমোহিনী রচনার খেলা খেলিতে পারে ইহাতে কোন প্রকারে প্রত্যয়ান্বিত নহে এই ব্যক্তি সত্তাকে কার্য্যকারিত্বের সহবর্ত্তী বলিয়াই মনে করে তবে ইহা সত্য যে কার্য্যকারিত্বের মূল অবলম্বনই সত্তা চিদানন্দাভিন্ন-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া মায়া বিবিধ রচনার খেলা খেলিতে থাকে।

মায়ার প্রবাহ অনাদি অনন্ত হইলেও কোন প্রবাহই স্থায়ী নহে। আর যাহা স্থিতিশীল, তাহাকে প্রবাহ বলিলে ব্যাঘাত দোষ আসে।

কাজেই সমষ্টিভাবে প্রবাহ অবিনশ্বর হইলেও ব্যষ্টিভাবে ক্ষণবিনাশীই বটে যেরূপ প্রবাহ ছাড়া জলের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই, মায়ার সম্বন্ধেও সেইরূপ দেখিতে পাই রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি যে কোন মায়িক প্রবাহ বহিতে থাকে ব্যক্তিগত ভাবে এ সকলগুলিই অস্থায়ী বলিয়া সাব্যস্ত হয় ব্যক্তিগতভাবে মায়িক প্রবাহ ক্ষণবিনশ্বর এক জন্য মায়ার কোন স্থায়ী ভাবাপন্ন স্বরূপ অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না তবে ইহা সত্য যে মায়া অস্থায়ী স্বরূপে নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিলেও অবোধ লোক তাহাকে স্থিতিশীল বলিয়াই মনে করে এমন কি ব্রহ্ম হইতেও মায়াকে সমধিক মর্যাদান্বিত বলিয়াই জানে অবশ্যই মায়াকে বাদ দিয়া দেখিলে জগৎ শূন্যময় বোধ হয়, কিন্তু স্বয়ং প্রকাশ চিন্ময় সত্তার উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিতে পাওয়া যায় তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ ইচ্ছা করিলেই এই অনাময় সত্তায় মনকে একাকার করিতে পারেন

ঘটনা সমষ্টি ছাড়া মায়ার কোন আপন স্বরূপ অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না তবে স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ ও কার্য্যভেদে ঘটনা ইয়ত্তার অতীত এইজন্য আপাতদর্শী বা অনন্যদর্শী লোক ও কারণ ভাবাপন্ন ঘটনা সমূহকে স্থায়ী ভাবাপন্ন মনে করে কিন্তু বিশেষদর্শীর বিচারে স্থায়ী বস্তু ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই সাব্যস্ত হয়না আর পরিণাম প্রাপ্ত জিনিষ যে চিরস্থায়ী এই বিষয়ে কোন দৃষ্টান্তও নাই কাজেই যাহারা বিকারগ্রস্ত জিনিষকে সত্য মনে করে তাহাদিগকে কিপ্রকারে প্রশংসা করিতে পারা যায়? প্রকৃতি বল, আর শক্তি বল, কিন্তু উভয়েই যে পরিণামের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে তাহা অবিসম্বাদিত সত্য অপরিণাম নৈসর্গিক জিনিষ যদিও আছে তথাপি উহা অজড় চৈতন্য বলিয়া কখনও প্রকৃতি বা শক্তির অন্তঃপাতী হইতে পারেনা কারণ চৈতন্য ও জড় উভয়েই বিরোধী ভাবাপন্ন আর সমভাবাপন্ন জিনিষই যে উহার অন্তর্গত হয় তাহার

উদাহরণও সচারাচর দেখিতে পাওয়া যায়। স্ফুলিঙ্গ উষ্ণস্পর্শ ও শুক্লভাস্বর রূপবিশিষ্ট বলিয়াই অনলের অন্তর্নিবিষ্ট।

মায়া জগৎ-কারণ হইলেও জগৎ ছাড়া নহে। আর পরিণাম উপাদান কারণ হইতে যে কার্য্য পৃথক্ বা ভিন্ন নহে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সুতরাং এক মায়াই কার্য্য কারণ উভয়রূপ বলিয়া জগৎকে মায়াময় বলা যায়। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতে যে কোন ঘটনা ঘটিতেছে তাহা কার্য্য বা কারণরূপ মায়ার অন্তঃপাতী কিন্তু কারণ যে বিকারের দায় এড়াইতে পারেনা তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। যাহাই হউক, মায়াবাদ স্বীকার না করিলে দার্শনিক ভাবে কিছুতেই জগতের ব্যাখ্যা হয়না। এজন্যই কৃতবিদ্য সমাজে আজ শঙ্করভাষ্যের গৌরব বাড়িতে চলিয়াছে এবং মেঘমালার অন্তরালে থাকিয়া পৃথিবীর সম্রাটের ন্যায় ঈশ্বর যে জগৎ শাসন করিতেছেন এইরূপ ধারণার মহিমাও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। জড়বাদী যদিও আপন কৃতনৈপুণ্য দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তথাপি মনীষী সমাজ বেদান্তকে একটা অসার জিনিষ বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতে সাহসী হইতেছেন না। কেনন সম্যক বিচারে চৈতন্যই নিত্য বস্তু বলিয়া সাব্যস্ত হয় আর চৈতন্য যে জড়ের পরিণাম ইহা কেবল কথার কথা মাত্র এইজন্য যে, চৈতন্য ব্যতীত জড়ই প্রতিপন্ন হয় না। তবে ইহা সত্য যে চৈতন্য ও জড় উভয়ই অনাদি। অনন্ত ভাবের দিক দিয়া দেখিলে ও জড়কে প্রবাহরূপে অবিনাশী স্বীকার না করিয়া পারা যায় না এইজন্য যে, কোননা কোন জড় বস্তুর সাক্ষীরূপেই চৈতন্য আপনাকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে জড়ের সর্ব্বথা বিলোপ হইলে চৈতন্যের কোন অর্থ থাকেনা। কাজেই বুঝিতে পারা গেল যে মায়া পরিণামের দায় হইতে মুক্ত না হইলেও সমষ্টি ভাবে কখনও তাহার বিনাশ হইবার নহে। অর্থাৎ মায়ার লীলা

খেলা কখনও একবারে বন্ধ হইবে না কেননা ঘটনা শূন্য কালের কল্পনা করিতে যাইয়া মানুষ কোননা কোন ঘটনাকেই পুরোবর্ত্তী দেখিতে পায় তবে যাহারা পরান্তকালে বিশ্বাস করে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, বিশ্বাস যদিও বিচার ঔদাসীন্যের সূচনা করিয়া দেয় তথাপি জগতে ইহার শক্তি বড় কম নহে

মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান নামে অভিহিত হইলেও উহাদের অর্থগত কোন পার্থক্য নাই ভক্ত যে জগৎকে শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র বলিয়া মনে করে তাহাকে বেদান্তবিৎ বুধমণ্ডলী মায়ার বিলাস মাত্র জানে কেননা কার্য্য কারণের অতীত নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে জাগতিক ব্যাপারের সংশ্রবে আনাতে অজ্ঞানেরই সূচনা হইয়া থাকে অবশ্যই ব্রহ্মের অবলম্বন ব্যতিরেকে মায়া কিছুই করিতে পারে না, তথাপি মায়িক ঘটনায় ব্রহ্ম নির্লিপ্তই থাকে আর চৈতন্য স্বয়ং প্রকাশ রূপ হওয়াতে ব্রহ্ম যে সদা একরস ও নির্ব্বিশেষ তাহা বিচারে নিবিষ্ট হইলেই বুঝিতে পারা যায় ব্রহ্মের অবলম্বনে মায়া পরিণামের খেলা খেলিতেছে বলিয়াই অবিশেষদর্শী তাহাকে সবিকার সুতরাং সগুণ মনে করে, মায়া ও ব্রহ্মের স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার নৈপুণ্যের অভাবই ইহার হেতু অবোধ লোক মায়ার আপাতমনোরম পরিণাম-মোহে বিমোহিত হইয়া অপরিণাম পরব্রহ্মের মহিমা বুঝিয়া উঠিতে পারে না সে মনে করে যে এইরূপ মনোবিমোহন-লীলা পরব্রহ্মেরই বটে এমন কি এই লীলাকে মায়িক বলিতে তাহার অরুন্তুদ যাতনার উদয় হয় ভক্তবৃন্দ ভক্তিরসে বিভোর হইয়া যদিও অবিশেষদর্শীর মন মাতাইয়া তুলে বটে তত্ত্বজ্ঞানী তথাপি তাহাদিগকে কিছুতেই বিশেষদর্শীর সম্মান দেয় না কেননা তাহাদের মূলভিত্তি অবিবেকের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন তবে ভক্তির অর্থ যদি নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মের অনুসন্ধান রূপ হয়, তবে বলিবার কিছু থাকে না

ব্রহ্মবিদ্যা।

ব্রহ্ম বিদ্যার সেবনে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা পূর্ণাংশে চরিতার্থ না হইলেও মানুষ ইহা হইতেই পরম শান্তি লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মবিদ্যার ব্যপদেশে যদিও অনেকে লক্ষ্মীর-আবাহন এবং যশোর্জ্জন করিয়া লয় তথাপি ইহার মুখ্য ফল অর্থলাভ বা নাম কেনা নহে। কেননা ব্রহ্মবিদ্যা বুঝাইয়া দেয় যে, ধন, যশ ও মান সমস্তই মায়া বিজৃম্ভন ও মিথ্যা। তবে যদৃচ্ছাক্রমে যদি এই বিষয় সুসম্পন্ন হইয়া যায়, এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার সেবনকারীকে দোষী করা যায় না। কিন্তু বক জ্ঞানী ও সখের জ্ঞানীর কথা স্বতন্ত্রই বটে। যাহাই হউক, ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন ও উন্নতি সাধন দ্বারা আর্য্যজাতি যে গৌরবান্বিত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যভূমিতে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে লোকের প্রীতি বা সদ্ভাব কমিয়া যাইতেছে তথাপি অপরাপর দেশের তুলনায় ইহাকে এই বিষয়ে হীনাবস্থাপন্ন বলা যাইতে পারে না। অবশ্যই আর্য সভ্যতার সময়ে ব্রহ্মবিদ্যা উন্নতির অন্তিম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও বিবেচ্য যে একমাত্র ব্রহ্ম বিদ্যার উন্নতিতেই মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় না; পক্ষান্তরে সকলেই যে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী তাহাও নহে। কাজেই পৃথিবীতে ব্রহ্মবিদ্যা যেরূপ আবশ্যক জিনিষ লৌকিক বিদ্যাও সেইরূপ উপেক্ষনীয় নহে। ফলতঃ নিরপেক্ষভাবে বিচারে নিবিষ্ট হইলে বুঝা যায় যে ব্রহ্মবিদ্যা ও লৌকিক বিদ্যার সমন্বয়েই মানবের পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে। একে ঔদাসীন্য দেখাইয়া অপরের গোড়া হইলেই কুফল ফলিতে থাকে। কেননা যেরূপ লৌকিক বিদ্যায় অতীব অনুরাগ "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ" নীতি লইয়া আসে, ব্রহ্মবিদ্যায় অতিশয় অনুরক্ত ব্যক্তিও সেইরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

পৃথিবীস্থ নিখিল মনুষ্য কখনই মুক্তির অভিলাষী নহে, এমন কি সহস্র লোকের মধ্যে একজন মুমুক্ষুও পাওয়া কঠিন। সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে যাহারা মুক্তির ইচ্ছা রাখেন, তাহাদিগকে লৌকিক বিদ্যার অধ্যয়নে উৎসুক না করিলে পামর ও অলসের সংখ্যা যে বাড়িতে থাকিবে তাহাতে কি সন্দেহ আছে? তবে ইহা সত্য যে ব্রহ্মবিদ্যার অধীনে লৌকিক বিদ্যাকে না রাখিলে বিপরীত ফল হইয়া দাঁড়ায়। কেননা একমাত্র লৌকিক বিদ্যার এরূপ শক্তি নাই যে পশুভাবের বেগ দমন করিতে পারে। বর্ত্তমান পৃথিবীতে যে পাশব ভাবের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় পরাবিদ্যায় ঔদাসীন্যই তাহার মুখ্য কারণ। আর ইন্দ্রিয় সন্তর্পণ যে পশুভাব সাধারণ তাহাও সর্ববাদী সম্মত। কাজেই বিবেকী, দূরদর্শী কখনও ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকে দেবভাব বলিতে পারেন না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, অবিবেকী কৃতবিদ্য যে ইহাকে ঐ ভাবের পরিচ্ছদ পরাইতে চাহেন তাহারও দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যাহাই হউক, অপরা বিদ্যাকে স্বাতন্ত্র্য দিলে যে কুফল ফলিতে থাকে তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে একমাত্র অপরাবিদ্যা জানিয়াও মানুষ সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে এইরূপ যাহা শুনিতে পাওয়া যায় বিচারে তাহার মূলে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন ভাবে পশুভাবই ধরা পড়ে। কার্য্যের উদ্দেশ্য শুদ্ধি হইলেই উহা দেবভাবের হয়, এইজন্য যাহার উদ্দেশ্য অবিগীত নহে, সেই কার্য্যকে দেবভাব মূলক বলা যাইতে পারে না।

"ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ব বিদ্যানাং" গীতা হইতেও ব্রহ্মবিদ্যার মহত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। না বুঝিতে পারিবারই বা কারণ কি? ব্রহ্মবিদ্যাকে বাদ দিয়া এমন কোন বিদ্যাই দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা মনে পরম শান্তি আনিয়া দিতে পারে। লৌকিক বিদ্যার অনুশীলনেও চিত্ত প্রসাদ আবির্ভূত হয় বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহা

চিরস্থায়ী নহে। তার ইহাও অসত্য নহে যে লৌকিক বিদ্যার বিষয় বস্তুনিচয়ের মধ্যে এমন জিনিষ বিরল যাহা মৃত্যু বা পরিবর্ত্তনের দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবে। কাযেই নশ্বর বিষয় লইয়া মন খেলা করিতে থাকিলে, কোন না কোন সময়ে তাহাকে খেলনার বিয়োগজনিত দুঃখভোগ করিতেই হইবে। ব্রহ্মবিদ্যা এরূপ নহে, কেননা তাহার বিষয় চির অমর ও সদা একভাবাপন্ন। যদিও ব্রহ্মবিদ্যার বিষয়গতি সহজ ব্যাপার নহে, তথাপি যোগ্য অধিকারী অধ্যবসায়ের সহিত নিরন্তর ব্রহ্ম বিচার করিতে থাকিলে অবশ্যই একদিন না একদিন ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব সুখে সুখী হইতে পারে। আর একবার এই অনুভব আসিলে যদৃচ্ছায় অনুভবনীয় জিনিষের পুনরানুভবও সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। কেননা ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানরূপ ও প্রত্যেক বস্তুর সাক্ষী। এমন জিনিষ অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না ঐ সাক্ষী যাহার প্রকাশক নহে। রবি, সাগর, পর্ব্বত প্রভৃতি সমস্ত বস্তুরই সাক্ষ্য ঐ জ্ঞান হইতে পাওয়া যায়। জ্ঞান নাই অথচ ঘটনা ঘটিতেছে ইহা আকাশ কুসুমের ন্যায় অসত্য।

ব্রহ্ম প্রত্যেক বস্তুর আসল স্বরূপ হইলেও এই তত্ত্ব ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন ব্যতিরেকে বুঝিতে পারা যায় না। লৌকিক বিদ্যা লইয়া জীবন যাত্রায় অগ্রসর হইলে মায়া, প্রকৃতি বা অতিপরমাণুর চৌহদ্দির ভিতরে থাকিয়াই কাল হরণ করিতে হয়। কেননা এই তিনের অন্যতরকেই এই বিদ্যা মূলবস্তু বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। আর এক কথা এই যে লৌকিক বিদ্যায় লিপ্ত হইয়া পড়িলে, কিছুতেই গুণগত সৌন্দর্য্যলোলুপতা যাইবার নহে। মানুষের মন আপন আপনি যে গুণের বিমোহে আত্মহারা হইয়া পড়ে তাহার দৃষ্টান্ত সচরাচর পাওয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার গবেষণায় গুণের প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়া লইতে না পারিলে কোন প্রকারে তাহার মোহ হইতে অব্যা

হতি পাওয়া যায় না এইজন্য শ্রীভগবান বলিয়া গিয়াছেন "প্রকৃতেগুর্ণ সংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণ কর্ম্মসু ” নাস্তিকের কথা দূরে থাকুক, বিশেষ দর্শনের অভাবে অনেক আস্তিক মহাশয়েরাও গুণ লইয়াই জীবনের লীলাখেলা করিতেছেন যদ্যপি তুরীয়গা ভূমিকায় না পৌঁছা পর্য্যন্ত বিশেষদর্শীও সর্বথা গুণের মড়যন্ত্র হইতে অব্যাহতি পান না, তথাপি তিনি ইহাকে মায়াময় ও অসত্য বলিয়াই মনে করেন আর বস্তু অনুভব করিয়াও যে মিথ্যা জানা যায়, তাহার দৃষ্টান্তে দূরস্থ আকাশের নীলিমা রাখা যাইতে পারে অবশ্যই আমরা মণি মুক্তা প্রভৃতি বিষয়কে স্থায় মনে করি কিন্তু অনুভূতির পূর্ব্বে বা পরে উহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাই না কেবল তুল্যভাবে বস্তুজ্ঞানের পুনরাবৃত্তি দেখিয়া ক্ষণাবনশ্বর বস্তুকেও স্থিতিশীল বলিয়া বিনা প্রমাণে ধরিয়া লই যাহাই হউক অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতে যে গুণের অদম্য প্রতাপ তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না

লৌকিক বিদ্যা বিষয়ীর প্রতি তটস্থ থাকিয়া একমাত্র বিষয়তত্ত্ব বিশ্লেষণেই আপনার বাহাদুরী দেখাইয়া থাকে কেননা যাহা পড়িয়া বিষয়ী সম্যকরূপে বুঝিয়া লইতে পারে এইরূপ কোন পুস্তক লৌকিক বিদ্যায় আছে কিনা এই বিষয়ে সন্দেহই থাকিয়া যাইতেছে পক্ষান্তরে এই বিদ্যার অনুশীলনে বিষয়ের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলেও উহার প্রকৃত তত্ত্ব অবোধ গম্যই থাকিয়া যায়। যদ্যপি লৌকিক বিদ্যার উন্নতিতেই আজ পৃথিবীতে মানব বুদ্ধির অসাধারণ শক্তি ব্যক্ত হইতে চলিয়াছে, তথাপি এই শক্তিকে দৈবী শক্তি বলিতে কুণ্ঠিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না কেননা ইহার বিকাশে পার্থিব সুখের লালসাই বাড়িতে দেখা যায় আর এই লালসা যে অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষিক ভাবের দিকে লইয়া যায় তাহাতেই বা কি সন্দেহ আছে ? কাযেই প্রতিচ্য ভূমিতে

লৌকিক বিদ্যার আশানুরূপ উন্নতি হইলেও দেবভাবের সঙ্কোচই দেখিতে পাওয়া যায় যদ্যপি পাশ্চাত্য সভ্যতাতে পার্থিব সুখের সমতার জন্য ও উদ্যোগ দেখিতে পাই, তথাপি ঐ সুখ, দুঃখেরই পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী, যাহার পূর্ব্বে বা পরে দুঃখের আবির্ভাব হয় না এইরূপ সুখের অনুসন্ধীৎসা প্রতিচ্য জাতিতে অতীব কম। তবে বিশ্বপ্রেম ও ভোগসাম্যের অনেক কথা আমরা প্রতিচ্য পণ্ডিতের নিকট শুনিতে পাই কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার আশানুরূপ প্রসার না হইলে উভয়ই কথার কথায় পরিণত থাকিয়া যাইবে। আর দেহাত্ম ভ্রান্তি প্রসূত স্বার্থপরতার তিরোভাব যে একমাত্র লৌকিক বিদ্যার সেবনে হইতে পারে তাহার অব্যভিচারী দৃষ্টান্ত অদ্যাপি দৃষ্টিপথে আসে নাই

ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ের প্রকৃতি যথার্থরূপে বুঝাইয়া বিষয়ীকে হস্তামলক বৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোচর করিয়া দেয় অধ্যবসায়ের সহিত এই বিদ্যার যথাযথ অনুশীলন করিলে অবিলম্বে বা বিলম্বে অধিকারী অবশ্যই অভয়পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে আর অভয় পদে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা চরিতার্থ করিয়া মানুষ পৃথিবীতে ধনকুবের বা প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া উঠিলেও ব্রহ্মাত্মার সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বের বিকাশ অপূর্ণ অবস্থাতেই থাকে যদিও ব্রহ্মবিদ্যা হইতে বিষয়ের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না, তথাপি উহার তত্ত্ব এক এক করিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় বস্তুতত্ত্বের আসল জ্ঞান একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা হইতেই লব্ধ হইতে পারে কাযেই লৌকিক বিদ্যার রাশি রাশি পুস্তক পড়িয়া ফেলিলেও অবিদ্যার মোহ-জাল ছিন্ন হইবার নহে তবে উহা হইতে কৃতবিদ্য বলিয়া অতত্ত্ব জ্ঞানী সমাজে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারা যায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কেননা ইদানীন্তন বসুন্ধরাতে লৌকিক বিদ্যার সমাদরই

অধিক। এমন কি যে তত্ত্বজ্ঞানী এই বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহার পক্ষে সংযমী হওয়া সুকঠিনও বটে। যাহাই হউক, ব্রহ্মবিদ্যা যে মানুষকে অনির্ব্বচনীয় শান্তির অধিকারী করে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ব্রহ্মবিদ্যার অনেক অনুশীলনকারী যদিও সংসারের অভাব মিটাইতে পারেন না তথাপি তাঁহারা যে ব্রহ্মাত্মার অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এই সম্বন্ধেও সন্তোষজনক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারা যায় না। আর বেদান্তের অনুশীলনে ও যে অনেকের অবিদ্যার আবরণ উন্মোচন হয় না তাহার ও একাধিক উদাহরণ রহিয়াছে।

ধর্ম্মালোচনার ক্রমবিকাশ যে ব্রহ্ম বিদ্যাতে নিঃশেষ হইয়াছে, তাহা বৈদিক সাহিত্যের যথাযথ পরিচয়ে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। কে বলিতে পারে যে এই বিদ্যার আবিষ্কার করিতে আর্য্যজাতির কত সময় লাগিয়াছে? মানব বুদ্ধিকে মায়িক বস্তুর চতুঃসীমার বাহিরে লইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন, সুতরাং কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড অতিক্রম করিয়া জ্ঞানকাণ্ডে উপনীত হইতে যে কত গবেষণার আবশ্যক হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করিয়া উঠা সহজ ব্যাপার নহে। ঋষি-বৃন্দ সাংসারিক সুখকে তুচ্ছ মনে করিয়া ব্রহ্ম বিদ্যার অনুশীলনে যদি জীবন উৎসর্গ না করিতেন তবে কি পর ব্রহ্মকে "প্রতিবোধ বিদিত" বলিয়া প্রত্যক্ষতঃ ধারণা লইতে পারা যাইত? আর ব্রহ্মাত্মার সাক্ষাৎকার না হইলে যে, কলুর বলদের ন্যায় মায়িক প্রাঙ্গনেই ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাহার কথা কি? পরমশান্তির কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের অভাবে অশান্তির আগুনে পুড়িয়া না মরিলেও তাহার তীব্র উত্তাপ সহ্য করিতেই হয়। মানুষ অপ্রবুদ্ধ অবস্থাতে ঐ আগুন নিবাইতে যতই চেষ্টা করুক না কেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। পর্ণশালা বা তরুতলবাসী ঋষিগণ যে রাজ মহলের সুখকে ও অগণ্য মনে করিয়া

ছিলেন,"প্রতিবোধ বিদিত' পুরুষের অনুভবই তাহার অসাধারণ কারণ।
এই অনুভব হইলেই মানুষের মনে এরূপ দৈবীশক্তির সঞ্চার হয় যাহা দ্বারা মায়িক বস্তু হইতে উহা স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ইহার অভাবে যে মায়ার বন্ধন হইতে সর্ব্বথা অব্যাহতি পাওয়া যায় এরূপ দৃষ্টান্ত নাই বলিলেই চলে। যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম বল, আর ভক্তি বল কোন জিনিষই মায়ার অলঙ্ঘনীয় সেতুশৃঙ্গ পার করিতে সমর্থ হয় না, কেননা উভয়েই মায়াময় বস্তু অধিকার করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তবে ইহা সত্য যে অজ্ঞান অবস্থাতে মানুষ কর্ম্ম ও ভক্তি হইতে অনেক উপকার লাভ করে। অজ্ঞানীর কর্ম ও ভক্তি নিষ্কাম নহে কিন্তু উহাদ্বারা যে পাপবৃত্তি গুলি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যাহা হউক, ব্রহ্মবিদ্যা অর্জ্জন করিয়া অজ্ঞান আবরণ উন্মোচন করিতে না পারিলে মানুষ যে যথাযথ রূপে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পৃথিবীর হিতব্রত উদ্‌যাপনে সমর্থ হয় তৎসম্বন্ধে কোনও ধ্রুব প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারা যায় না।

কবে এইরূপ হৃদয় সন্তর্পণকারী ঘটনার আবির্ভাব হইবে যে পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত লোক ব্রহ্ম বিদ্যার অমৃত সলিলে স্নান করিয়া অবিদ্যার মালিন্য নিঃশেষে ধুইয়া ফেলিবে। যদিও ইহা কল্পনারহ তবধ বিশেষ তথাপি মহান্ ভাবের সমীরণ না বহিলে ইহার আশা ত হওয়া সুদূর পরাহত। কোন্ অনুদার প্রকৃতির মন এই প্রকার কল্পনা দ্বারা উদ্বেলিত হইয়া থাকে? কাযেই মহৎ কল্পনা যে মানুষের মহত্ত্ব সূচনা করিয়া দেয়, তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু মহৎ কল্পনাও সকল সময়ে অবশ্যম্ভাবী ফলের সূচনা করিয়া দেয় না। যাহাই হউক, ব্রহ্মবিদ্যার পুস্তক যদি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পাঠ্য পুস্তক হইয়া দাঁড়ায় তবে অবশ্যই শিক্ষিত সমাজে অবিদ্যার অন্ধকার অনেক কমিয়া যাইবে এবং "ভোগ ও স্বর্গঃ" নীতি কখনও আমাদের

জিনিষ বলিয়া পরিগণিত হইবে না কেননা এই বিদ্যার সেবনে মায়িক বস্তুর সত্যত্ব বিপর্য্যস্ত স্বতঃই করিতে পারা যায় আর ইহাই যে ঐ নীতি প্রবর্ত্তনের মূলে রহিয়াছে তাহাও বিচারে ধরা পড়ে। দেখিতে পাওয়া যায়, বিলাসী এবং ভোগ পরায়ণ ব্যক্তি ভোগ্য বস্তুকে সত্য বলিয়াই ধারণা করিয়া বসিয়াছে এই শ্রেণীর মধ্যে এমন লোক বিরল বলিলেই চলে যে, ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহা গ্রহণ করিতে পারে। রাম শ্যামেরত কোন কথাই নাই মান্য গণ্য লোককে ও জগৎ মিথ্যা ইহা শুনিবামাত্র ব্যাক্তভাবে বা মনে মনে ক্রুদ্ধ হইতেই দেখা যায়

সুখের বিষয় এই যে, লৌকিক বিদ্যার বিশ্বব্যাপিনী প্রস্তুতির সময়েও পৃথিবীর অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার মহত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। যদিও এইরূপ লোকের সংখ্যা অতীব কম তথাপি আশা করা যাইতে পারে যে ইহাদের ভাব ক্রমনীতিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে কেননা এই শ্রেণীর উপরে শিক্ষিত সমাজের সদ্ভাব ব্যতীত অসদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না তবে ইহা সত্য যে জগতে জ্ঞানী অপেক্ষা অজ্ঞানীর সংখ্যা চিরকালই অধিক থাকিবে। "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।" শ্রীভগবানের উক্তি ও ইহারই সমর্থন করে। আর লোক নীতিতে ও দেখা যায় যে, উৎকৃষ্ট জিনিষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট জিনিষেরই প্রচলন অধিক প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় অতিসূক্ষ্ম এইজন্য স্থূলবুদ্ধি লোকেরা ইহা হইতে দূরে অবস্থান করে যদি দৈবযোগে তাহাদের কেহ ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, তবে কোনরূপ কোন মায়িক জিনিষকেই ব্রহ্ম বলিয়া ধরিয়া লয় পৃথিবীতে সূক্ষ্মবুদ্ধি লোকের সংখ্যা কম বলিয়াই ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনকারীর সংখ্যা ও অল্প। বিশেষতঃ অবিদ্যার বন্ধন কাটিতে যাওয়া সকলের কর্ম্ম নহে।

তাই বলিযা ইহার প্রতি অবজ্ঞা করাও মূঢ়তাব কার্য্যই প্রতিপন্ন হইবে কারণ মূঢ় ভিন্ন অন্যকেহ ব্রহ্ম বিদ্যাকে অসার বলিতে পারে ন' যাহা হউক, এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে শিষ্ট সম্প্রদায কখনই ইহাকে অবজ্ঞা করিবেন না। কারণ ইহা যেরূপ বিশেষদর্শীব অনুভবের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ যুক্তির অজেয় দুর্গেও সংরক্ষিত বটে

কোন কোন কৃতবিদ্য ধর্ম্ম সম্প্রদায প্রবর্ত্তক ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদ্য সগুণ ব্রহ্ম, এইরূপ ব্যক্ত করিযা গিয়াছেন কিন্তু বিবেকীব নিরপেক্ষ বিচারে যখন গুণাতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই তন্ন তন্ন করিযা বুঝাইয়া দেয, তখন কিপ্রকারে ঐ মহাপুরুষ দিগের বাক্যকে আপ্তবাক্য বলিযা স্বীকার করা যায? আব কি প্রকাবেই বা তাঁহাদের সাম্প্রদাযিক ভাবকে হৃদয়ে পোষণ করিযা বিশ্বব্যাপি ব্রহ্মাত্মভাবের অবমাননা করিতে সাহস হয? তবে অন্ধ বিশ্বাসের কথা স্বতন্ত্র, কারণ ইহা অসম্ভবকে ও সুসম্ভব করিযা তুলে। ফলতঃ গুণ যে মাযিক, অনিত্য তাহা সুষুপ্তি অবস্থ বুঝাইযা দেয কারণ ঐ অবস্থাতে গুণের বিপ'্ণ ধ্বংস থাকিতেই দেখ যায়। কাযেই ব্রহ্মবিদ্যাকে সগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক বলিলে তাহার অভিধেয় যে নিত্য বস্তু এই সত্যের অপলাপ না হইযা থাকে ন' যদিও সগুণ বস্তু নিত্য হইতে পারে বলিয়া ঐ শ্রেণীব মহাত্মাদিগের স্বপক্ষ সমর্থন রহিয়াছে তথাপি উহা বিবেকীর বিচারে অসারগর্ভই প্রতিপন্ন হইযা পড়ে। আব সগুণ নিত্য বস্তুর প্রত্যক্ষ উদাহরণও পাওযা যায ন বিশেষ গুণের সহযোগে যে আত্মপ্রত্যক্ষের কথ নৈযাযিক মহোদয়গণের নিকট শুনিতে পাই তাহাও পরীক্ষাতে কেবল ঐ গুণের প্রত্যক্ষেই পরিণত হইযা পড়ে কেননা সুখ দুঃখ ■ভৃতি গুণ ও উহাদের অনুভূতি ব্যতিরেকে ঐ গুণের আধাররূপ কোন স্বতন্ত্র আত্মা যে অন্তর্জগতে আছে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবধার্যের অভাবে

গুণ ও তাহার অনুভূতির সংহতিকে অবোধ লোক অনুভূতি হইতে অতিরিক্ত বস্তু বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রবুদ্ধ মহাপুরুষ স্বয়ং খণ্ডখণ্ড বিষয় এবং একভাবাপন্ন চির অমর বিষয়ী ব্যতীত অপর কোন জিনিষ দেখিতে পান না।

সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া নিরপেক্ষভাবে প্রশ্নবিদ্যার অনুশীলন করিলে অবশ্যই এই তত্ত্বে উপনীত হইতে হয় যে, নিত্য বস্তু এক অখণ্ড জ্ঞান, তাহাকে অবলম্বন করিয়া জল বুদ্বুদের ন্যায় বিষয়রাশি উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। কুশাগ্রবুদ্ধি ভগবান শঙ্করাচার্য্য, শারীরক ভাষ্যের প্রারম্ভে বিষয় ও বিষয়ীর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, একমাত্র ইহাই নহে, উভয়ের অন্যোন্যাধ্যাস-মূলক যে বৈধ বা অবৈধ সমস্ত ব্যবহার ইহাও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তত্ত্বদর্শনের প্রভাবে এই অধ্যাসের অবসান না হইলে মানুষ কিছুতেই বিষয় ও বিষয়ীকে যথাযথরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং তত্ত্বদর্শীর গ্রন্থে যে বিষয় ও বিষয়ী সম্বন্ধে প্রকৃত গবেষণা হইয়াছে তাহা বিবেকীর মন মানিয়া লইতে চাহে না। যাহাই হউক, জ্ঞান যে অনাদি অনন্ত এক এবং অখণ্ড তাহা বিচারশীল ব্যক্তিকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, কেননা জ্ঞানের অভাব কোন সময়ে বা অবস্থাতে ধরা পড়ে না। স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞান সর্ব্বদাই সকল ঘটনার সাক্ষীরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। জ্ঞান নাই অথচ ঘটনা ঘটিতেছে ইহার ন্যায় অসম্ভব বিষয় জগতে কমই পাওয়া যায়। আন্তর বাহ্য যে কোন ঘটনা সম্বন্ধে ভাব যায়, জ্ঞান হইতেই মানুষ ইহাদিগকে বুঝিয়া লইতে পারে। পরন্তু জ্ঞানকে বিষয় হইতে পৃথকভাবে ধরিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। এমন কি অনেক দার্শনিকও উহাকে বিষয়ের সঙ্গে একাকার করিয়া লন। যদিও তত্ত্বদর্শন না হইলে জ্ঞানের প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায় না, তথাপি স্মৃতি ও অনুব্যবসায়

জ্ঞান সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে উহা যে বিষয় হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র তাহার আভাস পাওয়া যায়

যে অদ্বৈতবাদের গৌরব আজ শিক্ষিত সমাজে বাড়িতে চলিয়াছে উহা ব্রহ্মবিদ্যারই অন্তিম বিকাশ মাত্র কেননা ইহা অপেক্ষা কোন সার বা সূক্ষ্মতত্ত্ব উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় না কেবল উপনিষদ কেন, পৃথিবীর কোন ধর্ম্মগ্রন্থেই নাই বলিলেও চলে প্রত্যেক বস্তুর সার অংশ এক অখণ্ড চৈতন্যকে বুঝাইয়াই অদ্বৈতবাদ নিবৃত্ত হয় নাই, উহার সত্তাই যে নিখিল বস্তুর সত্তা ইহাও সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে তবে যে অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ পড়িয়াও অনেকে মায়িক বস্তুর সত্যত্ববিপর্য্যাস হইতে অব্যাহতি পায় না, তাঁহার কারণ আশয় পরিজ্ঞানের অযথা ভাবই বটে আর অতি কম লোকেই যে অদ্বৈতবাদকে সম্যকরূপে বুঝিয়া লইতে পারে তাহাতেই বা কি সন্দেহ আছে? যাদব মাধবের কথা দূরে থাকুক কৃতবিদ্য ব্যক্তিও স্থলবিশেষে সূচিভেদ্য অন্ধকার দেখিয়া থাকেন কাযেই যাহারা অন্ধ বিশ্বাসকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয় তাহারা যে উহা হইতে সগুণ বা ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বর আবিষ্কার করিয়া লইবে তাহাতে কি আশ্চর্য্য আছে? দুঃখের বিষয় এই যে, যখন যুক্তি ও বিশেষদর্শীর অনুভব প্রতিবোধ বিদিত চিন্ময় বিষয়ীকে নিত্য বস্তু বুঝাইয়া দেয় তখন অন্য কোন বিষয়কে উহা মনে করাতে বিচার বৈকল্যই পরিচয় হইয়া থাকে। যাহাই হউক, দিন দিনই যে অন্ধ বিশ্বাসের গর্ব্ব খর্ব্ব হইতে চলিয়াছে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আশানুরূপ শিক্ষার বিস্তৃতি হইলে কেবল নিরক্ষর লোকের মধ্যেই অন্ধবিশ্বাস আবদ্ধ থাকিবে। সুতরাং উহার রাজত্ব একবারে উচ্ছেদ না হইলেও আয়তন যে অত্যন্ত খর্ব্ব হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অসদাগ্রহ ও গোঁড়ামি, শিক্ষিত লোকের পক্ষে কখনই শ্লাঘার বিষয়

নহে। সুতরাং অদ্বৈতবাদ যখন যুক্তি ও অনুভবের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন তাহার প্রতি অবজ্ঞা বা ঔদাসীন্য কখনও বিচারশীলের বার্য্য হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাত্মা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানরূপ এক আত্মা বলিয়া সাম্প্রদায়িকতার জঞ্জালে অদ্বৈতবাদী মনীষী কখনও লিপ্ত হইতে পারেন না; কেননা বিরুদ্ধবাদীর আসল স্বরূপ তাঁহার নিজের স্বরূপ হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নহে ফলতঃ আপন আত্মা ব্যতীত অপরের আত্মা সম্বন্ধে যখন কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না তখন ইহা আমার, উহা অন্যের এই প্রকার ভেদ বুদ্ধির কোলাহল ইহাতে উত্থিত হইবার নহে সার্বিক ভাবের দিক দিয়া দেখিলে ও নিজের এবং অপরের সমস্ত ঘটনা বা বস্তু এক ভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়ায় বাঘের মোটর ভ্রমণ ও হিরক খচিত ভবন যেরূপ মায়াময় মিথ্যা, সেইরূপ শ্যামেরও বটে। আর যাঁহার এই সম্বন্ধে ইতরবিশেষ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি প্রকৃত অদ্বৈতবাদী নহেন কেননা পৃথিবীতে যে অদ্বৈতবাদের ভাণ চলে, তাহারও দৃষ্টান্ত আছে।

জীবের আসল স্বরূপকে সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলে প্রকৃত অদ্বৈত তত্ত্বে যাওয়া যায় না উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও শঙ্করভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের অধ্যয়নে অবশ্যই বুদ্ধি মার্জ্জিত এবং ব্রহ্মাত্মার পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইতে পারে, কিন্তু উহার সাক্ষাৎকার তন্ন তন্ন করিয়া অন্তর্জগতের যথাযথ বিশ্লেষণের উপরই নির্ভর করে এমন কি সামান্যরূপে বেদান্ত পড়িয়াও যদি এই বিশ্লেষণে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, তবে নিশ্চয়ই উপনিষদ প্রতিপাদ্য পুরুষের দর্শন লাভ হয় বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে গ্রন্থ অধ্যয়ন করা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে তটস্থ হওয়া শ্লাঘার কথা নহে। কেননা শাস্ত্রানুশীলন ব্যতীত বুদ্ধি সুমার্জ্জিত হইতে দেখা যায় না এবং বুদ্ধি সুমার্জ্জিত

না হইলে সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিতে মানুষ অযোগ্যই থাকিয়া যায় আর একমাত্র বিচারই যে তত্ত্বদর্শনের অব্যভিচারী কারণ তাহা যেরূপ শাস্ত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ তত্ত্বদর্শীও পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়া থাকেন কাযেই ভজনের দোহাই দিয়া বেদান্ত পাঠে বিরত হইলে চলিবে না প্রকৃতপক্ষে ভজন ও বিচারের সহযোগ অতি আবশ্যকীয় একের গোঁড়া হইয়া অপরের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে ইহার কারণ এই যে, বিচারে বস্তু নির্ণয় ও ভজনে মন একাগ্র হয় যেরূপ বিচারের অভাবে বস্তু নির্ণয় সম্বন্ধে অজ্ঞানের অন্ধকার থাকিয়া যায়, সেইরূপ ভজন ব্যতীত চিত্তের একাগ্র পরিণামও অসম্ভবই বটে আর বিক্ষিপ্ত চিত্তের ব্রহ্মানুভূতিকে কিছুতেই ব্রহ্মদর্শন বলিতে সাহস করা যায় না। অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শনকে ধারাবাহিক করিবার জন্য চিত্তের একাগ্র পরিণাম অপরিহার্য্যরূপে বিধেয় যিনি চিত্তকে একাগ্র করিতে পারেন না, তাঁহার ব্রহ্মদর্শন বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় ক্ষণিক, ও অফলোপধায়ক।

ব্রহ্মবিদ্যার সার অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস করিতে না পারিলে যে পরম শান্তিতে বঞ্চিত থাকিতে হয়, তাহার কারণ এই, মূল বস্তুর অপরোক্ষ অনুভূতি এবং মায়িক জিনিষের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় অপর কোন মতে হইবার নহে আর উভয়ে কৃতকার্য্য না হইতে পারিলে প্রথমের জ্ঞান লালসা জনিত অবসাদ ও দ্বিতীয়ে আসক্তি কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। তবে লোকদেখান শান্তির হাবভাব আত্মলাভ করে যাহাই হউক, অদ্বৈততত্ত্ব সম্যক্ অবগত না হইলে মনুষ্যজন্ম যে বৃথাই চলিয়া যায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এজন্যই উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, আযে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ তমেব

বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি • নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায় ” “একমেবা দ্বিতীয়ং” “নেহনানাস্তি কিঞ্চন” শ্রুতির এই অংশ যুগল অদ্বৈতবাদ যে সত্য ইহাই জ্ঞাপন করিয়া দেয় কাযেই যাঁহারা ভেদবাদের মোহে পড়িয়া অদ্বৈতবাদকে অগণ্য জিনিষে পরিণত করিতে ছাড়েন না, তাঁহাদের বুদ্ধির গৌরব গাইয়া কি প্রকারে কালহরণ করিতে পারা যায় ? এবং কি প্রকারেই বা বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও মনের মানুষের প্রেমমদিরাতে বিভোর হইয়া থাকিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে ? অবশ্যই অদ্বৈতবাদের ব্রহ্ম যদি স্বতঃ অপরোক্ষ না হইত, তবে তাহার জন্য মিথুনজ সুখে জলাঞ্জলি দেওয়াতে কখনও সুবিবেচনার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত না। কেননা যে জিনিষ কখনও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোচর হয় না, তৎসম্বন্ধে বুদ্ধিমান ব্যক্তির সন্দেহ থাকিয়াই যায় এই জন্যই অনুমাণ বা অন্ধ বিশ্বাসের ঈশ্বর ইদানীন্তন সময়ে অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না যদ্যপি বেদান্তের ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এইরূপ অভিযোগ আনা যাইতে পারে, তথাপি অন্তর্মুখ হইলে অবশ্যই স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম, সুশিক্ষিত ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে আর ব্রহ্ম যখন স্বতঃ অপরোক্ষ জ্ঞানরূপ, তখন তাহার সাক্ষাৎকার কি প্রকারে লুপ্ত-গ্রহ-দর্শনের ন্যায় অসম্ভব হইতে পারে ? তবে যিনি অবিদ্যার আবরণের ভিতরেই রহিয়াছেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।

মানুষ সুশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হউক না কেন, সকলেরই আপনার প্রতি অতুল প্রেম দেখিতে পাওয়া যায় এমন কি আপনার তরে গৃহিণী, পুত্র, ধন, জন, সমস্তই বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়া পড়ে। তবে যে প্রেমের দায়ে বা অন্য কোন কারণে আত্মঘাত করিতে দেখা যায় তাহাও দুর্ব্বিসহ দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সুতরাং অদ্বৈতবাদে যে জীবের আসল স্বরূপকে

ব্রহ্ম বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা প্রেম, ভক্তির অপলাপ হইবার নহে অবশ্যই অনেক ভক্তির পক্ষপাতীও অদ্বৈতবাদীর উপরে শুষ্কতা বা নীরসতার অভিযোগ আনিতে কুণ্ঠিত হননা, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে আত্মোৎসর্গের ভাব অদ্বৈতবাদেই পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায় কেননা জীবভাবকে ভুলিয়া অবিশ্রান্ত ব্রহ্মভাবে বিভোর হইতেই ইহা উপদেশ করে। ব্রহ্মাগ্নিতে জীবত্বকে দগ্ধ করিতে না পারিলে অদ্বৈতবাদের উচ্চভূমিকায় আরোহণ করিতে পারা যায় না যদ্যপি প্রীতিভাজনের জন্য আত্মসুখে জলাঞ্জলি দেওয়ার ভাব ভক্তি-বাদীরও রহিয়াছে, তথাপি তাহা হইতে আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের আশা কিছুতেই ছাড়িতে পারে না আপনাকে স্বতন্ত্র ভাবে বজায় রাখিয়া প্রভুর সেবক বা সেবাদাসী হওয়াকেই ভক্তিবাদী অস্তিমপদ বলিয়া মনে করে তবে অহৈতুকী ভক্তির কথা যে ভক্তিবাদীর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকারী তত্ত্বজ্ঞানী, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর নিদিধ্যাসনকেই অহৈতুকী ভক্তি বলা হইয়াছে আর গীতাতেও জ্ঞানী ভক্তের উল্লেখ বারম্বার দেখিতে পাওয়া যায় একমাত্র ইহাই নহে, অধিকন্তু ভাগবতেও "আত্মারামাশ্চ মুনয়োনি-র্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূত গুণো হরিঃ" অভিহিত হইয়াছে প্রকৃত পক্ষে পরব্রহ্মকে আপন আত্মা বলিয়া জানা অপেক্ষা প্রেমের অধিক সূচনাকারী আর কি হইতে পারে? শুনিতে পাওয়া যায় যে প্রেম বিলাসিনীরা ও আপন প্রেম পাত্রকে আত্মা বলিয়া সম্বোধন করে অপরের প্রতি প্রেম যে আত্ম প্রেমের উপসর্জনীভূত তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে

ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাব স্মৃতি পুরাণ এবং তন্ত্র প্রভৃতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও এই সকল গ্রন্থে কর্ম্ম ও উপাসনার সবিশেষ আলোচনা হইয়াছে, তথাপি ব্রহ্মবিদ্যার সেবনে যে পরম পদ প্রাপ্তি-

হয় ইহাও অপ্রতিপাদিত হয় নাই। এমন কি ব্রহ্মবিদ্যার অবমাননাকারী আর্য গ্রন্থ নাই বলিলেই চলে। তবে যে অর্ব্বাচীন কোন কোন গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি অসদ্ভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে কিছুই আসে যায় না। কেননা উহার মূলে যুক্তির পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই বিদ্বেষও অমূলক নহে, কেনন ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিয়া অনেকেই মায়িক বস্তুতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে এবং উহাই মূল ভিত্তি করিয়া ঐ গ্রন্থগুলির আবির্ভাব হইয়াছে। এইজন্য ব্রহ্মসত্তাই মায়িক বস্তুর সত্তা এই সারতত্ত্বের কথা শুনিয়া যে ঐ গ্রন্থ সমূহের অনুরাগীরা অপ্রবৃত্তিস্থ হইয়া পড়ে তাহার কথাই কি? সবিশেষ বৃত্তান্ত এই যে মায়া ও জীবের অসত্যত্ব অবধারিত হইলে ভোগ বিলাসের উপকরণগুলি এক এক করিয়া অফলোপধায়ক হইয়া যায় এইজন্য ভোগ বিলাসে আসক্ত ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিকূল ছাড়া অনুকূল নহে। সুতরাং ভোগে লিপ্ত থাকিয়া সাধ মিটাইবার তরে অভিনব উপায় যে এই শ্রেণীর মানবের জন্য আবশ্যক তাহাতে কি সন্দেহ আছে? যাহাই হউক, এই গ্রন্থ সমূহ হইতে সংসারাসক্ত ব্যক্তির মনে আসার সঞ্চার হইলেও নিবৃত্তি মার্গের কোন সহায়তা পাইবার নহে। ঐ গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া কাহাকেও পরম পদের উদ্রেক হইতে দেখা যায় না। যদ্যপি ভেদবাদ সমর্থনের উদ্দেশ্যে ঐ গ্রন্থরাজিতে ও যুক্তির অবতারণা হইয়াছে তথাপি কোন যুক্তিই অদ্বৈতবাদ সমর্থক যুক্তিগুলির প্রতিযোগিতা করিতে পারে নাই। তবে ঘরে বসিয়া আপন মতের বড়াই করার কথা স্বতন্ত্র।

ব্রহ্মবিদ্যার অভিধেয়াবগতিতে সকলে অধিকারী না হইলেও উহার প্রতি সদ্ভাব রাখা মনুষ্য মাত্রের পক্ষেই উচিত, কেননা উহা কোন সম্প্রদায় বিশেষকে অধিকার করিয়া প্রবর্ত্তিত হয় নাই,—উহাতে কোন বিষয়ে পক্ষপাতের ছায়া মাত্রও পতিত হয় নাই। ধর্ম্মপরায়ণ

প্রজাবৎসল সম্রাটের সভাসদ হইতে সকলের যোগ্যতা না থাকিলেও তাঁহার প্রতি ভক্তি দেখাইতে প্রজা মাত্রেরই তটস্থ হওয়া কর্ত্তব্য নহে কারণ যাঁহারা পরাবিদ্যার কুৎসা গানে অভ্যস্ত, তাঁহাদের কার্য্যকে যেরূপ আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করা যায় না, তাঁহাদিগকে সেইরূপ বসুন্ধরার হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া ধারণা করিতেইবা কি প্রকারে সাহস হয়? কারণ পৃথিবী হইতে ব্রহ্মবিদ্যার তিরোভাব হইলে জড়বাদের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া মানুষ যে ক্রমশঃ অজ্ঞাতসারে মনুষ্যত্ব হারাইয়া বসিবে তাহার সম্ভাবনাকে অলিক বলা যাইতে পারে না পক্ষান্তরে পরাবিদ্যায় সদ্ভাব রাখিলে অবশ্যই কোননা কোন সময়ে অবিদ্যার অন্ধকারে পড়িয়া থাকিবার জন্য মনে অনুতাপ আসিবে এই জন্য যে, ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনকারীর মধ্যে অনেকেই ঐ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া ফেলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে অধ্যবসায়ের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার সেবন করিলে অন্ততঃ মায়িক বস্তুর আসক্তি ক্ষীণ কলেবর হইয় পড়িবে বিশেষতঃ যাহার অনুশীলন না করিলে অভয় পদে উপনীত হইতে পার যায় না, তাহার প্রতি অবজ্ঞা বা অসদ্ভাব প্রকাশ করাতে অদূরদর্শিতাই সূচিত হয়। সুতরাং এইক্ষণে উপসংহারে এই বলিয়া নিবৃত্ত হইতেছি যে,— 'ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ, ব্রহ্মপশ্চাৎ ব্রহ্মদক্ষিণতশ্চোত্তরেণ, ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং "

সমাপ্ত।